অপরূপা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ

মাঘ ১৩৬৫

প্রকাশক

কানাইলাল সরকার

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর

ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার

শ্রীগোপাল প্রেস

১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,

কলিকাতা-৪

ব্লক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

প্রচ্ছদ শিল্পী

সমীর সরকার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই

তৈফুর আলি মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

॥ দাম চার টাকা ॥

প্রথম যখন গল্প লিখতে আরম্ভ করি, কয়লা-কুঠির সাঁওতাল কুলি-কামিন আর বীরভূম-বর্ধমানের নিতান্ত সাধারণ মানুষগুলিই ছিল আমার গল্পের চরিত্র। যে ভাষায় তারা কথা বলে হুবহু সেই ভাষাই দিয়েছিলাম তাদের মুখে। বাংলা দেশের একটি অঞ্চলের ভাষা। সে-ভাষা যাঁরা কখনও শোনেন নি, তাঁদের কাছে কেমন যেন একটু নতুন-নতুন ঠেকতো, জায়গায় জায়গায় বুঝতে একটু কষ্ট হতো।

একদিন আমার এক বন্ধু আমাকে সেকথা বললে। বললে, ওগুলো আর লিখো না। অনেকে বুঝতে পারে না।

অথচ সাহিত্যের যেখানে কারখানা—অর্থাৎ খাস্ কলকাতা শহরে এর কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনছি না। খ্যাতনামা সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদকেরা লেখা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। বন্ধুরা বলছে, চমৎকার। জ্ঞানীগুণী বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁরা, তাঁরাও প্রশংসা করছেন।

একদিকে এই অযাচিত সম্মান, আর একদিকে আমার মনের এই সংশয়।

সাহিত্যে এই আঞ্চলিক ভাষা চলবে কি চলবে না ভাবছি, এমন দিনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হলো আমার পরিচয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ভাষাটা একেবারে দুর্বোধ্য অবশ্য নয়, কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোক তোমার গল্প পড়তে গিয়ে হোঁচট খাবে।

আর কিছু বলবার প্রয়োজন হয় নি। সেই থেকে কোনও গল্পে প্রাদেশিক ভাষা আর আমি ব্যবহার করি নি। এমন-কি বীরভূম মানভূমের মানুষের মুখেও দিয়েছি শান্তিপুরের ভাষা।

মনের সংশয় কিন্তু তখনও আমার কাটে নি।

ভাবছিলাম রবীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লিখি। তিনি কি বলেন জেনে নেওয়া যাক্।

কিন্তু সে দুঃসাহস আমার হলো না কিছুতেই। লিখি লিখি করেও লিখতে পারলাম না।

'কয়লা-কুঠি' 'অতসী' 'ষোলো-আনা' 'বান-ভাসি' 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী'—পরের পর অনেকগুলি বই বেরিয়ে গেল এই সময়। সবগুলিই আঞ্চলিক ভাষায় লেখা। ভাবলাম, বইগুলি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিই।

শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় বই পাঠিয়েই শুনলাম রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নেই।

কিছুদিন পরেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। প্রবাসী মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। প্রবন্ধের নাম—'সাহিত্যে নবত্ব'। দেখলাম সেই প্রবন্ধে তিনি আমার লেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রশংসা করেছেন আমার গল্পের।

প্রবন্ধের নীচে কি যেন একটা জাহাজের নাম। শুনলাম তিনি সুমাত্রা যাবার পথে জাহাজ থেকে লেখাটি পাঠিয়েছেন।

ফিরে যখন এলেন, তখন আমরা 'কালি-কলম' বের করেছি। তখনকার দিনের শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক প্রভাতদা (শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়) মাঝে মাঝে দয়া করে আসতেন আমাদের কালি-কলম আপিসে। তিনিই একদিন এসে বললেন, রবীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকেছেন।

বরানগরে শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহালানবিশের বাগান-বাড়িতে গেলাম দেখা করতে। গেলাম ভয়ে-ভয়ে। ভয়ও যত, আনন্দও তত।

ভয় অবশ্য তিনি নিজেই ভেঙে দিলেন। প্রণাম করতেই দু'হাত বাড়িয়ে পরমাত্মীয়ের মত বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ধন্য হলাম তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে। ধন্য হলো আমার সাহিত্য।

সেদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করবো কিনা।

বলেছিলেন, নিশ্চয়ই করবে।

এই নিয়ে আরও অনেক কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সে-সব কথা আজ নাই-বা বললাম।

এখানে যে গল্পদুটি ছাপা হলো, এ-দুটি সেই তখনকার দিনের লেখা। প্রথম গল্পটি যেমন ছিল হুবহু ঠিক তেমনি ছাপা হলো। দ্বিতীয় গল্পটির নাম ছিল বান-ভাসি। এখন তার নাম দেওয়া হলো অপরূপা।

টালা পার্ক
কলিকাতা : ২

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

তারাশঙ্করকে দিলাম

এই লেখকের লেখা

বধূবরণ
কয়লাকুঠির দেশ
ভাল লাগার নেশা
ঠিক-ঠিকানা
বন্ধুপ্রিয়া
অনাথ-আশ্রম
হোমানল
ক্রৌঞ্চ-মিথুন
আজ শুভদিন
শৈলজানন্দের শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বনির্বাচিত গল্প
কমল-মণি
ডাক্তার
বন্দী (নাটক)
শহর থেকে দূরে
মানে-না-মানা
অভিনয় নয়
ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন
ভূতুড়ে বই
অসম্ভব
আমার মা
শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

ষোল-আনা

বীরভূমের সীমান্তভূমি। অদূরে সাঁওতাল-পরগনার শালের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের এপারে ছোট্ট একখানি গ্রাম। গ্রামে না-আছে ডাক্তারখানা, না-আছে ইস্কুল, না-আছে পোষ্টাপিস। রেল-ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে।

গ্রামে একটি মেয়ে ছিল—পরমা সুন্দরী। রুক্মিণী তার নাম। মা, বাপ, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নাই। কিছু জমিজমা ছিল, দিন তার তাহাতেই বেশ চলে। বাল্যকালে স্বামী মারা গিয়াছে, কিন্তু এই এত রূপ লইয়া একলা ঘরে সে যে কেমন করিয়া কোন্ সাহসে দিন কাটায়, তাহার চেহারাখানা একবার চোখে না দেখিলে সে-কথা বুঝা কঠিন। কৈশোর তাহার বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে, যৌবন কাটিয়াছে কিনা ঠিক বলা যায় না, কারণ এই সব মেয়েদের যৌবনের সীমারেখা টানিয়া দেওয়া বড় শক্ত। বয়স তখন তাহার প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি, এমন দিনে গ্রামের মধ্যে একটা কথা হঠাৎ রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, রুক্মিণী নাকি পথভ্রষ্টা হইয়াছে। কথাটা সত্য, এবং এ-সত্য রুক্মিণী যেমন ঢাক পিটাইয়া কাহাকেও বলিয়া বেড়াইল না, তেমনি আবার গোপনও করিল না। তাহারই মত আত্মীয়-স্বজনহীন এক যুবক—জ্ঞাতি-গোত্রে, জাতিধর্ম্মে, কোনটার সঙ্গেই রুক্মিণীর সহিত তাহার মিল নাই, তথাপি কোন্খানে যে তাদের মিলন হইয়া গেল কে জানে, রুক্মিণী তাহাকে নিজের ঘরে আনিয়া রাখিল। সমস্ত গ্রামের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এই অশাস্ত্রীয় আচরণের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়া যাহার জিহ্বায় যতখানি বিষ ছিল সকলেই তাহা সানন্দে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে এই দুইটি চরিত্রদুষ্ট নরনারীর উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু রুক্মিণী বা রাখাল, কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও কেহ শুনিতে পাইল না।

ইহাদের লইয়া সব চেয়ে বেশী আস্ফালন করিল হরি পণ্ডিত। গ্রামের মধ্যে মাতব্বর-মুরুব্বি বলিতে এক তাহাকেই বুঝায়। বয়স তাহার পঞ্চাশের ওপর, অত্যন্ত রুগ্ন দুর্ব্বল তাহার চেহারা, পাঠশালা করিয়া খায়। সেই হরি পণ্ডিত যখন দেখিল, বাহিরে আন্দোলন-কোলাহল করিয়া কিছুই হইবার নয়, তখন একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, সে নিজেই রুক্মিণীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

রাখাল ঘরে ছিল না, তেলের একটা প্রদীপের সুমুখে বসিয়া রুক্মিণী বোধকরি রাখালেরই একটা জামা সেলাই করিতেছিল। পায়ের শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া কি একটা কথাও যেন বলিতে গেল, কিন্তু সুমুখে সহসা হরি পণ্ডিতকে দেখিয়া চুপ করিয়া হাতের জামাটা সে সরাইয়া রাখিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া এই আগন্তুককে অভ্যর্থনাও করিল না, বসিতেও বলিল না।

হরি পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে বলিল, ই-টা কি তুর্ ভাল হচ্ছে রুকি ?

কি ?—বলিয়া রুক্মিণী তাহার মুখের পানে তাকাইল।

সে চোখ, সে মুখ হরি পণ্ডিতের অপরিচিত নয়, তথাপি হঠাৎ যেন সে তাহার প্রশ্নের খেই হারাইয়া ফেলিল; কিয়ৎক্ষণ ইতঃস্তত করিয়া বলিল, এই নিয়ে ছোঁড়ারা সব চেঁচামেচি করছে কিনা, তাই বলি, এইটা কি—এই এই রাখ্লা রইছে কিনা তুর্ কাছে—এই আর-কি !

হরি পণ্ডিত কি কথা বলিবার জন্য যে আজ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে সেকথা বুঝিতে রুক্মিণীর দেরি হইল না। মাথা হেঁট করিয়া বাঁ হাত দিয়া প্রদীপের শিখাটা একটুখানি তুলিয়া দিয়া বলিল, হুঁ।—তা' কি করতে হবেক্ আমাকে শুনি?

হরি পণ্ডিত এতক্ষণ চালার নীচে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল, কিন্তু শীতের সন্ধ্যায় চারিদিকে হিম পড়িতেছিল বলিয়া তাহার আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা চলিল না, ধীরে ধীরে গায়ের চাদর-খানায় ভাল করিয়া আপাদমস্তক মুড়িয়া লইয়া সে উপরে উঠিয়া আসিল এবং সুমুখের একটা থামে হেলান দিয়া মুখোমুখি বসিয়া পড়িয়া অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় কহিল, বলি ই-সব কাজ চুপি-চুপি-ই ভাল রুকি, বুঝলি? গুটেক্ জানাজানি করে কি দরকার তুর্? রাখ্‌লা বেশ ত ছিল আপনার নিজের ঘরে, ই-আপদ কেনে আবার তুই জানাজানি করে টেনে আনলি বল্ ত?

প্রত্যুত্তরে রুক্মিণী বলিল, হরি কাকা, তুমি যাও।

আ-হা-হা-হা-হা, আমি তোর ভালর জন্যেই বলছি রুকি! গাঁয়ের ষোল-আনা ত সে কথা শুনবেক্ নাই। উয়ারা ভাববেক্··· পতিত্ করবেক্, ভক্ষি-ভূজ্যি বন্দ করবেক্—তুর্ সঙ্গেও, উয়ার সঙ্গেও—তা জানিস? আমি খালি ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখছি। বলি—না, গদাই গাঙ্গুলির ঝিটি—

রুক্মিণী বলিল, তা করুক্।

হরিপণ্ডিত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কাঁচা বয়েস কিনা,—ছি, ছি, তাই কি হয়? না, সেটা ভাল?

হঁ, খুব হয়, সেই ভাল।

তা' হ'লে তুই ছাড়বি নাই রাখ্‌লাকে, লয়?

রুক্মিণী ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। রাগে ও লজ্জায় মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না; অন্যমনস্কভাবে জামাটা

টানিয়া লইয়া আবার সেলাই করিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ আবার কি ভাবিয়া সেটা সরাইয়া রাখিল।

শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়া হরি পণ্ডিত জড়সড় হইয়া বসিল, বলিল, হুঁকো-কলকের যোগাড় নাই তুর্ ঘরে, লয় ? রাখ্লা খায় না ?—উঃ ! ই-বছর বড়ো জাড়্। এই পর্যান্ত বলিয়াই সে একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া মিনিটখানেক চুপ করিয়া রহিল : তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল, হুঁ,—তবে তুই এক কাজ কর রুকি,—গাঁয়ের সব ছেলেছোকরার পাট্টিকে একটো ফিষ্টি-টিষ্টি দে, বুঝলি ? তা না হলে উয়ারা আগুন-খাপ্পা হঁয়ে রইছে—

আলোটা মন্দ জ্বলিতেছিল না, তবু তাহার পলিতাটা রুক্মিণী আর-একবার উস্কাইয়া দিয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, ছোকরাদের কাহুকে আর চিনতে বাকি নাই আমার। টাকা আমার নাই, তুমি যাও।

হরি পণ্ডিত আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, গদাই গাঙ্গুলির বিটি—বলে কিনা টাকা নাই ! হাসি-দুঃখুর জ্বালা ! দে—দে কিছু রুকি, তুর্ হাত ঝাড়লে পব্বত। আজ এই জাড়ের রেতে তাহ'লে পলোয়ার জোগাড় দেখি।

রুক্মিণী বলিল, না, না, সত্যি বলছি—সত্যি আমি লার্ব উয়াদিকে খাওয়াতে।

হরি পণ্ডিত এইবার হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা লে, টাকা তুখে দিতে হবেক নাই। রাখ্লার দুটো বড় বড় পাঁঠা আছে পচা বাগদির ঘরে—বল্ তাহলে একটা লি-গা আমরা।

রুক্মিণী কহিল, তার ছাগল সে যদি না দেয় ?

কথাটা শুনিয়া হরি পণ্ডিত তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিল। অর্থ এই যে, রাখালের জিনিসে তাহার অধিকার নাই, একথা শুনিয়া মানুষের হাসি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে হাসি

রুক্মিণীর নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, অথচ এই লোকটার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেকক্ষণ হইতেই মনে-মনে সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল, তাই সে অবশেষে আর কোনও উপায় না দেখিয়া বলিয়া দিল, আচ্ছা, তাই লাওগা যাও— !

আনন্দাতিশয্যে মিনিটখানেক হরি পণ্ডিতের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

বেশ বেশ তাহলে লি-গা, বেশ—বলিতে বলিতে অবশেষে সে তাহার ঘোড়ার মত দুই পাটি বড় বড় দন্ত বিকশিত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু 'পলোয়া'র আয়োজন করিতে গিয়া খিচুড়ির বেশি আর হইয়া উঠিল না। 'পলোয়া'র খরচ অনেক। হরিপণ্ডিত নিজেই পচা বাগদির ঘরে গিয়া পাঁঠাটি নিজের কাপড়ের প্রান্তভাগে বাঁধিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল।

পুব-পাড়ার মাঝখানে হরিপণ্ডিতের বাড়ীর দরজার কাছেই সরকারি কালী-ঘর। উঁচু একটা ঢিপির উপর বহুদিন হইতে সংস্কার অভাবে এই খড়ো বাড়ীটি পড়ি-পড়ি করিয়াও কোন রকমে টিঁকিয়া আছে। মাঝখানে একটুখানি উঠান। চারিদিকে ঘলঘষি ও ঘেঁটুগাছের জঙ্গল। সম্মুখে দুইটা প্রকাণ্ড গাছ। একটা বকুল, একটা বেল। পাশেই প্রস্তরমূর্ত্তি কাল-ভৈরব এক মহাদেব থাকেন, পূর্ব্বে নাকি তাঁহার একটা ইঁটের মন্দির ছিল, মাত্র গোটাকয়েক ইঁট ছাড়া এখন আর সে মন্দিরের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। গ্রামের একটা ধর্ম্মের ষাঁড় পূজার ফুল ও বেলপাতা খাইতে আসিয়া মহাদেবের এই মূর্ত্তিটিকে প্রতিদিন উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া যাইত, তাই গ্রামের লোক দয়া করিয়া মূর্ত্তিটির চারিদিকে ফণীমনসার গাছ পুঁতিয়া দিয়াছে। এখন আর সে

কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করা ষাঁড়ের পক্ষে সহজ নয়। পূজারী ঠাকুর দূর হইতে বাবা-শিবের উদ্দেশে বেলপাতা ও আতপ চাউল ছুঁড়িয়া দিয়া পূজা সমাপ্ত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। বিলুপ্তপ্রায় এই দেবতাটির নাম অনুসারে এই জায়গাটির নাম—ভৈরবতলা।

ছোট এই গ্রামখানির মধ্যে বৈঠকখানার বালাই কাহারও নাই। কাজেই এই ভৈরবতলার উঠানে আর ওই ফুটা কালী-ঘরটার উপরে সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা গ্রামের লোকের মজলিস বসে। দুপুরে চলে হরি পণ্ডিতের পাঠশালা। আজও সেই দুরন্ত শীতের রাত্রে খিচুড়ির লোভে সবাই সেখানে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। ভৈরবতলার উঠানে কালীপূজার বলি দিবার জন্য একটা হাড়িকাঠ বারোমাস পোঁতা থাকিত। তাহারই উপর সর্ব্বপ্রথমে রাখালের ছাগ-বৎসটির হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত হইয়া গেল এবং তাহার তাজা রক্ত হাতে মাখিয়া মহা আনন্দে ও উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে সকলে মিলিয়া কিয়ৎক্ষণ তাণ্ডব নর্ত্তন করিল।

পাঁঠাটি কাটিয়াছিল হরি পণ্ডিতের এক পিসতুত ভাই, এবং চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে পাঁঠার মুণ্ডুটি তাহারই প্রাপ্য। তাই তাহার প্রাপ্য বস্তুটি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বলি হইবার পরক্ষণেই হরি পণ্ডিত সেটি তাহার নিজহস্তে ঝুলাইয়া লইয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, এই শীতের রাত্রে শরীরগুলা গরম করিয়া লইবার জন্যই বোধকরি ছোকরারা তখনও পর্য্যন্ত পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে। দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ তাহার জ্বলিয়া গেল, চীৎকার করিয়া হাঁকিল,—কান্তে! ওরে ও শালারা! হোই ভুতো, ও নঁদা! বলি, এমনি ধেই-ধেই করে লাচবি নাকি সারারাত? চাল-ডাল পড়ে রইল ডাঙ্গায়, ধুতুক্ ধুতুক্ করে লাচছে দেখ ভালুকের পারা!

নাচন থামিল। উনান তৈরী হইতে, আগুন জ্বালাইতে, পাঁঠা ছাড়াইতে, চাল-ডাল মাংস চড়াইতে আরও ঘণ্টাদেড়েক লাগিয়া গেল। তাহার পর কালী-ঘরের একপাশে তালপাতার যে ছেঁড়া চাটাইটা পড়িয়া ছিল, তাহারই উপর জনকতক ছোকরা একটা লণ্ঠন লইয়া ছুরি দিয়া গণ্ডা-পাঁচ-ছয় আলু ছাড়াইতে বসিল। ভৈরবতলার অন্ধকার উঠানে দাঁড়াইয়া হরি পণ্ডিত উনানে-চড়ানো জিনিসগুলির তত্ত্বাবধান করিতেছিল, কিন্তু শীতকালের এই দুরন্ত ঠাণ্ডায় উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের উপর দাঁড়াইয়া থাকা, কাজটা তেমন সুবিধার নয়; তাহার উপর আশ-পাশের ঝোপ-জঙ্গলে বিছা, সাপ ইত্যাদি লুকাইয়া থাকিতেও পারে, এই ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে কালী-ঘরের উপরে উঠিয়া আসিল। নন্দলাল, পঞ্চু, কান্ত, ভুতো প্রভৃতি সকলে মিলিয়া যেখানে বসিয়া আলু ছাড়াইতেছিল, হরি পণ্ডিত তাহারই একধারে জড়-পুঁটুলি হইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিল।

নন্দলাল বলিল, খুড়ো, আজ তুমি বাঁয়ে শিয়াল করে গেইছিলে উয়ার কাছ্‌কে।

হরি পণ্ডিত বলিয়া উঠিল, বাঁয়ে শিয়াল কি রে, বাঁয়ে শিয়াল কি? এই হরি শম্মাকে ভয় করে না, এমন লোক আছে কেউ ই-গাঁয়ে? ছুঁড়ি কি সাধে দিঁয়েছে রে বাবা, দিঁয়েছে ভয়ে।

পঞ্চু বলিল, খুড়ার দৌলতে গরম গরম খিঁচুড়ি আর মাংস, খেঁয়ে লিয়া যাক প্যাট ভরে,—না, কি বল রে ভুতো!

হরি পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে বলিল, সে যদি দেখতিস রে বাবা, ছুঁড়ি আমার পা-দুটোকে জড়াঁই ধরে আর ছাড়ে না! বলি, ছাড় ছাড় ছুঁস না, তুই আমাকে ছুঁস না, কিন্তুক ওরে বাবা, সে কার বাবার সাধ্যি ছাড়ায়! বলে, বয়েসের দোষে যদি করেই

ফেলেছি কাকা, ত আমাকে কি সবাই মিলে ভড়ভড়াঁই ডুবোঁই দিলে ভাল হবেক—

কান্ত এতক্ষণ মন দিয়া সমস্তই শুনিতেছিল, এইবার আলু-ছাড়ানো হাতের ছুরিটা সজোরে মাটিতে ঠুকিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, হবেক, হবেক, একশবার হবেক! বেউশ্যে হারামজাদী! মনে নাই পণ্ডিত তোমার? উয়ার এতবড় আস্পদ্দা! সেদিনের সেই—সে-ই—

কথাটা পণ্ডিতের মনে থাকিলেও আজিকার রাত্রে সে যেন একটু নিরপেক্ষ হইয়াই বসিয়া রহিল।

কান্ত বলিল, চুপ করে রইলে যে ভারি? আমাকে বলে কি-না আমি ভৈরবীতলায় উয়ার হাত ধরে টেনেছি! আমার নামে বদনাম! আর শুধু আমার নামেই-বা কেনে! বলে নাই ওই ভুতোর নামে? বলে নাই হোই উ-পাড়ার রতন বাঁড়ুজ্যের নামে?

বাহিরের উঠানে যে-কয়জন রান্না করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া বলিল, এই কান্ত! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ই-ক্ষেত্তে আর উ-সব কথা তুলিস না।

অর্থাৎ দোষী সকলেই। রুক্মিণীর দিকে হাত বাড়ায় নাই, সেরকম মানুষ এ-গ্রামে খুব কম। কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িবে। সুতরাং কাজ নাই ও-সব আলোচনায়। চুপ করিয়া থাকাই ভাল।

কান্ত তাহার ছুরিখানা তুলিয়া লইল। আলু ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিল, ভারি ত রূপ, তার আবার দেমাগ দেখলে কি হয়!

হরি পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ রে জীবনে কোথা, জীবনে? ঘরে নাই নাকি?

ভুতো বলিল, কেনে, ঘরেই রইছে ত! চাল আনতে গেইছিলম, তখন ত ছিল।

তবে আসে নাই যে! ডেকেছিলি?

নিশ্চয় ডেকেছিলম। বললম, ষোল-আনার বামুণরা সব অধিষ্ঠান হবেন আজ ভৈরবতলায়, তুমিও যাবে, কিছু খাওয়া-দাওয়ার জোগাড় আছে।

হরি পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্লেক?

বল্লেক, হুঁ, যাব।

হরি পণ্ডিত রাগিয়া উঠিল, বলিল, লাটসায়েব আসবেক সেই খাবার বেলায়, আর আমরা শালারা উয়ার জন্যে এই জাড়ের রাতে রেঁদে মরি! যা ত মাখন, চট করে উয়াকে একবার শুধোই আয় ত? বল, ওহে লাটসায়েব তুমি আসবে কি না বল, তা না হলে তোমার কিসের খাতির হ্যা!

মাখন উঠিয়া গেলে কান্ত বলিল, হুঁ, আসবেক উ, না এলেই লয়! গাঁয়ের ষোল-আনা ত উয়ার উলটোঁাই লিলেক! কাশী থেকে ওই কার-না-কার মেয়েটা নিয়ে এল বিয়ে করে, তোমরা জানলে, চিঠি পেলে যে, মেয়েটার বিয়ে হঁইছিল আর-একবার, তবু—

নন্দলাল বলিল, একবার কি বলছ হে? দুবার। জীব্‌নের সঙ্গে ত এই তিনবারে বসলো, ছেলেপুলে হঁইছিল কি-না তাই-বা কে জানে বাবা!

কান্ত বলিল, ধন্যি রুচি যা-হোক! বামুনের ছেলে, তুঁই উ-মেয়েটাকে নিয়ে ঘর করছিস কি বলে! আমি হলে ত মাইরি যেদিন শুনেছি সেইদিনই কাশীর টিকিট করে' র‍্যাল্‌গাড়ীতে চাপাঁই দিয়ে আসথম।

হরি পণ্ডিত বলিল, এই যে, ঘর করা বার করছি উয়ার! মাখনা আসুক, কি বলে শুনি, আসে কি না দেখি, তারপর মজাটি দিছি বুজোঁই—

জীবনের বাড়ী বেশি দূরে ছিল না, মাখন ফিরিয়া আসিয়া

বলিল, বল্লেক, উ এখন আসতে লারবেক, খাবার সময় এসে পেসাদ নিয়ে যাবেক।

তিন চার জন এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, কেনে? কেনে?

মাখন বলিল, সায়েরতলি গেইছিল ছাদ্ধ করাতে, পায়ে ব্যাদ্‌না হঁইছে।

হরি পণ্ডিতের আর বসিয়া থাকা চলিল না, সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, উয়ার বেদনার কিছু বলে নাই! শোনো হে শোনো, তোমরা সবাই ত রইছ, এক রকম ষোল-আনাই ধরতে হবেক, শোনো, কাল থেকে জীবনের সঙ্গে আমাদের ভক্কি-ভুজ্যি বন্দ, হুঁকো, কলকে, লাপিত, বামুন,—সব। কাল ষোল-আনাকে এই ভৈরবতলায় ডাকাই এই কথা বলে দিতে হবেক, না কি বলছো তোমরা?

বাহিরে উঠান হইতে জনার্দ্দন বলিয়া উঠিল, জীবন বলে কি জানো পণ্ডিত? উ বলে যে, তোমরা যে চিঠি পেঁইছ কাশী থেকে, উটো ঘটকের চিঠি। যে শালা ঘটকালি করেছিল, একশ টাকা চুক্তি হঁইছিল, আশী টাকা দিয়ে তার বাকী ছিল কুড়ি টাকা। সেই টাকাটি জীবন দিতে পারে নাই বলে সে বদমাইসি করে ওই চিঠি লিখে দিয়েছে।

হরি পণ্ডিত বলিল, তা লিখুক, আমরা অতসব শুনব কেনে হে জনাদ্দন? ষোল-আনা কেনে তা শুন্‌তে যাবেক? পতিত করলম উয়াকে। বাস, ইবারে পেমান্‌ করুক, উ যাথে বিয়ে করে আনলেক সে ঠিক, চিঠি মিছে। বাস্‌, তা-বাদে উঠুক জাতে। হেঁ-হেঁ বাবা, ই কি খেলামামা পেঁয়েছ হে—একে বামুন, তার ওপর আবার বিয়ে বলে কথা! ওই ও মাধু, কড়াই-এর ঝোলটাতে নুন দিয়েছ ত? দেখো আবার সব দিক গোলমাল করে বসো না।

আমার কাছে সেটি হবার জো নাই বাবা। বলিয়া মাধু গোঁসাই একটা কাঠি দিয়া খিচুড়ির হাঁড়ি দুইটা নাড়িতে লাগিল।

কালী-ঘরের উপরে লণ্ঠনের আলোকে এতক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই, উঠিয়া দাঁড়াইতেই হরি পণ্ডিত দেখিল, বাহিরে জ্যোৎস্নার আলোয় ভৈরব-তলার অন্ধকার কাটিয়া গিয়া চারিদিক বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মেঘ নিম্মুক্ত আকাশ, বকুল ও বেল গাছের পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো ঘলঘষি ও ঘেঁটু বনের উপর মন্দ দেখাইতেছিল না। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। রাত্রি বোধকরি বারোটার বেশীই হইবে। শীত যেন একটুখানি বাড়িল বলিয়াই মনে হয়। তা হোক। মোটে তিনটি লণ্ঠন। তাহার মধ্যে একটা বেশ পরিষ্কার, বাকী দু'টা না-থাকার মধ্যেই। চাঁদ না উঠিলে খাইবার অসুবিধা হইত।

আর কত দূর হে মাধু, বলি ও জনাদ্দন, দেরি কত, দেরি কত? বলিতে বলিতে হরি পণ্ডিত নীচে নামিয়া আসিল।

মাধু একটা কলিকায় আগুন চাপাইতেছিল। দেরি আর-কি, মারে দিঁয়েছি ইবারে, বাস! বলিয়া কলিকাটা তাহার থেলো হুঁকার উপর চড়াইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণপণে টানিতে আরম্ভ করিল।

হুঁকাটা লইবার জন্য মাধুর দিকে হাত বাড়াইয়া হরি পণ্ডিত বলিল, বলি, ও জনাদ্দন, মাংসটো একবার চেখে-টেখে দেখলে নাই কেনে, নুন টুন আবার বেশি-কম কিছু হবেক নাই ত?

লোহার হাতা দিয়া কড়াই হইতে ফুটন্ত গরম খানিকটা মাংস তুলিয়া লইয়া জনার্দ্দন বলিল, দেখ তা হলে। কিসে দিব বল দেখি?

আ-হা-হা-হা-হা, আমি আবার কেনে, তুমিই দেখ, তুমিই দেখ—

হুঁকা-কলিকাটা মাধু তাহার হাতের কাছে বাড়াইয়া দিতেছিল, হরি পণ্ডিত বলিল, লাও, লাও; টানো, টানো। জনাদ্দন দেখছি ফ্যাসাদ কল্লেক হে, দাও তবে ওই শাল-পাতাটোর উপরেই দাও। না-হয় এই হাতেই দিবে ত তাই দাও, বলিতে বলিতে হুঁকার জন্য বাড়ানো-হাতটা জনার্দ্দনের দিকে বাড়াইয়া বসিয়া বসিয়া ঠিক কচ্ছপের মত হরি পণ্ডিত সেই দিকে একটুখানি অগ্রসর হইয়া গেল।

না হে, হাতে কি করে লিবে? বলিয়া জনার্দ্দন ঝোলসমেত সেই আধ-সিদ্ধ গরম মাংসের টুকরাকয়েকটা পাতার উপর ঢালিয়া দিতেই ঝোলটা ত গেলই, এমন কি দুই টুকরা মাংসও সেখান হইতে ছিটকাইয়া মাটিতে গিয়া পড়িল।

ধূলা ঝাড়িয়া সর্ব্বপ্রথমে মাটি হইতে মাংসের টুকরা দুইটা কুড়াইতে কুড়াইতে হরি পণ্ডিত বলিতে লাগিল, জাড়-কাল, হাতেই বা দিথিস, তা হলে আর লষ্টো হথো নাই! তা হোকগে, ই আর এমন কী লষ্টো হঁইছে। বলিয়া ধূলিমণ্ডিত মাংসের টুকরা দুইটা সে মুখে পুরিয়া দিয়া চিবাইতে লাগিল।

আহা বেশ, বেশ, বেশ হঁইছে। জনাদ্দন, মাধু-গোঁসাই যখন লেগেছে তখন কি আর—হেঁ হেঁ। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাহার আর কথা কহিবার অবসর হইল না, পাতা হইতে অবশিষ্ট মাংসের টুকরা কয়েকটা যথাসত্বর শেষ করিয়া দিয়া বলিল, গরম লাগবেক বলে হাতে দিব নাই বলছিলি জনার্দ্দন, কিন্তুক্ কই দে-দেখি তুঁই আর-এক ডাবু তুলে আমার হাতে, দেখি একবার। ই ত খাবার জিনিস, পাঁঠার মাংস বলে কথা—বলে, আগুন-শুদ্দ্যো হাজম হয়ে

যায় এই প্যাটে! তা যদি না হবেক, তবে ত বামুন হয়ে জন্মই বিথা রে ভাই জনাদ্দন। এই বলিয়া সে তাহার হাতটি আর-একবার বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, ওই আঁগাস-ফোঁপস বেছে বেছে,—বেশ লরম্-লরম্ দেখে—

আর-এক প্রস্থ চর্ব্বণ এবং আহারের পর কলসির জলে হাত-মুখ ধুইতে গিয়া হরি পণ্ডিত বলিয়া উঠিল, এঃ! জলটো কি কালা হে! ই যে দাঁত খিচেঁই কামড়াতে আসছে রে বাবা! ইঃ! লে, লে, মাধু, কলকেটা আর-একবার ঝেড়ে সাজ্, লিয়া যাক এক দম ভাল করে—দেখি হিল্‌হিলেনিটো থামে কিনা —ইঃ! ইঃ! বলিতে বলিতে উনানের কাছে আসিয়া তাহার হাত দুইটা সে গরম করিয়া লইতে লাগিল।

কলিকাটা সাজিয়া মাধু তাহার হাতে দিতেই হুঁকায় বসাইয়া সেটা সে বারকতক চোঁ চোঁ করিয়া টানিল। এমন সময় কাল-ভৈরবের কাঁটা-বেড়ার ওপারে স্পষ্ট চাঁদের আলোয় গাঁয়ের কয়েকটা ছেলেমেয়ের ওপর তাহার নজর পড়িতেই হরি পণ্ডিত চেঁচাইয়া উঠিল, ওহে, ইয়াদের জ্বালায় দেখছি আমাদের ফিষ্টি-টিষ্টি তুলে দিতে হবেক্ ইবার থেকে! বাবারে, বাবারে, রাত দু'পহর না তিন-পহর হলো, খাবার লোভে হতভাগা ছেলেগুলো আখুনও ঘুমোয় নাই হে! ভাবলাম, এত রেতে আর কে থাকবেক, তাথেই বলি হোক্‌গো রাত। কিন্তুক্—দাঁড়া ত রে! তুর্ ছেলের কিছু বলে নাই! এই বলিয়া হুঁকা-কলিকা লইয়া হরিপণ্ডিত তাহাদের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেই ছেলে-মেয়েগুলা 'ওরে বাবারে—ই শালা 'মহাশয়' রে' বলিয়া প্রাণপণে সকলে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কালী-ঘরের উপরে ছোকরাদের গল্পগুজব তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। মাধু গোঁসাই হাঁকিল, আলু নিয়ে আয়! খিঁচুড়ি নেমেছে। টক্ চাপাঁই দিই—

পঞ্চু ও নন্দলাল ছুইটা শালপাতার উপর ছাড়ানো আলুগুলা লইয়া আসিল।

মাখ্‌না এতক্ষণ কালী-ঘরের উপরে দেয়ালে ঠেস দিয়া রীতিমত নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল, খিচুড়ি নামিয়াছে শুনিয়া চট্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে হরি পণ্ডিতের কাছে আসিয়া বলিল, তা হোলে বাম্ভুনদিকে ইবারে ডেকে দিই পণ্ডিত ?

হুঁ, হুঁ, ডেকে দে, ডেকে দে, আর দেরি কেনে ?

মাখন চলিয়া যাইতেছিল, মাধু গোঁসাই তাহাকে সাবধান করিয়া দিল। বলিল, জাড়কালের রেতে ষাঁড়ের মতন চেঁচাস না গুটেক্‌, বুঝলি মাখ্‌না! ঘরের পাঁদাড় থেকে একবার করে দেগা হাঁকাই, আসে আসে, না আসে না আসে—

হরি পণ্ডিত বলিয়া উঠিল, ঠিকোই বলেছ গসাঁই, ই ত আর আমাদের মা-বাপের ছরাদ্দ লয় হে বাবু, ফিষ্টি।

অনতিদূরে পশ্চিমপাড়া যাইবার পথের বাঁকে মনে হইল হেট্‌ হেট্‌ করিয়া মুখে একরকম শব্দ করিতে করিতে কে যেন একটা গরু কিংবা ছাগল তাড়াইয়া আনিতেছে, কিন্তু মিনিটখানেক পরে মোড় ফিরিতেই দেখা গেল, গরুও নয়, ছাগলও নয়, গ্রামের নিতাই ডাক্তার তাহার ছোট টাট্টু ঘোড়াটির উপর চড়িয়া ভৈরব-তলার রাস্তা ধরিয়া নিজের বাড়ীর দিকে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, গায়ের রং ঠিক ফরসা বলা চলে না, এবং মুখমণ্ডলের নিম্নাংশ ঠিক মৌচাকের মত গোঁফ দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। ডাক্তারকে কিছুই বলিতে হইল না, গোলমাল শুনিয়া বকুলতলায় তাহার ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, কি বেটে, কি হে তোমাদের ?

হরিপণ্ডিত বলিল, এসো ডাক্তার এসো এসো, রেতে কি আবার ডাকে বেরেঁই গেইছিলে নাকি ?

আর দুঃখুর কথা বল্‌ছ কেনে পণ্ডিত? রাতদিন কি আর আছে আমাদের কাছে, ডাক্তার হবার বড়ো জ্বালা। বলিতে বলিতে ডাক্তার সেই আগাছার জঙ্গলের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথটুকু ধরিয়া সেইদিকেই আসিতে লাগিল।

এই ডাক্তার লোকটির অভ্যাস, বেশি কথা বলা। গল্প করিতে পাইলে সে আর উঠিতে চায় না, এবং এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা গ্রামের ছেলে-বুড়া কাহারও কাছে অবিদিত নয়। তাই মাধু গোঁসাই হরি পণ্ডিতকে একটা চিমটি কাটিয়া পূর্ব্বাহ্লেই সে বিষয়ে তাহাকে একটুখানি সতর্ক করিয়া দিল।

মুখে না বলিলেও সে ইঙ্গিত বুঝিতে হরি পণ্ডিতের দেরি হইল না। ডাক্তারের মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, আজ একটো ফিষ্টির জোগাড় করা গেইছে ডাক্তার, যাও তুমি এসো-গা তোমার এই বাহনটিকে রেখে। এই বলিয়া সে তাহার কৃশতনু খর্ব্বাকৃতি ঘোড়াটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে লাগিল।

হেঁ, হেঁ, বাহন, বাহন, মানে গণেশের যেমন ইঁদুর বাহন, ডাক্তারের তেমনি হেঁ হেঁ—বলিতে বলিতে ডাক্তারের সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দাড়ির জঙ্গল ভেদ করিয়া সাদা ধপ্‌ধপে দুই পাটি দাঁত বাহির হইয়া পড়িল। তারপর হাসি থামিলে সে আবার বলিতে লাগিল, ডাগর দেখে একটো ঘোড়া আমাকে ইবারে কিনতে হবেক্ পণ্ডিত, তা না হলে মানে কথা, সেদিন ওই পড়াশে গাঁয়ে, ওই যে ওই মুছলমানের গাঁটোতে, মাণিকপীরের গায়েন হছিল, কদম স্যাখ্ বল্লেক, দাড়াও ডাক্তার, শুনেই যাও, কি আর করি, দাঁড়ালম। উয়ারা গাইতে লাগলো ঃ

অবশেষে মাণিকপীর কি কাজ করিল
ঘোড়াতে চড়িয়া পীর হাঁটিয়া চলিল!

আমিত হেসেই খুন! বলি, লে-শালা, আমাকেই বলছে নাকি রে বাবা! মানে কথা, আমার উ ঘোড়াটোয় চাপা না-চাপা ছুই ত সমান, পা ছুটো ত' আমার মাটিতে সঁটর্‌তে সঁটর্‌তেই যায়। মানে কথা, তা তুমি ঠিক বলেছ পণ্ডিত, বাহন, বাহন!—বলিয়া ডাক্তার আবার হাসিতে আরম্ভ করিল।

মাধু গোঁসাই-এর অতিরিক্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, ভাবিয়াছিল ডাক্তার উঠিয়া গেলে মাংসে নুন-ঝাল হইয়াছে কিনা সেও একবার দেখিয়া দিবে। তাই সে অতিশয় আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, তাহলে যাও তুমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে এসো ডাক্তর, আমাদের ত হঁয়ে গেইছে—

ডাক্তার বলিল, কাপড় আর কি ছাড়ব মাধু, বসা যাক। একবারে খেঁয়ে-দেঁয়েই ঘর ঢুকবো গা। মানে কথা, এমনি এক আধদিন ফিষ্টি-টিষ্টি না হলে চলবেক্ কেনে। বেশ, বেশ, কিন্তুক বড়ো রাত হঁয়েছে হে! মানে কথা, যে রোগী আমি আজ দেখতে গেইছিলম, তার উপর হুমিওপ্যাথিক ওষুধ, মানে-কথা, 'ডাইগোমেটিস্' করতেই ত—

এইবার ঔষধ ও রোগীর গল্প আরম্ভ হইলে সহজে সে আর থামিতে চাহিবে না। মাধু গোঁসাই প্রমাদ গণিল। হরি পণ্ডিতের পিঠের কাছে সে বসিয়াছিল, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, জীবনের কথাটো ডাক্তারকে একবার শুনোই দাও পণ্ডিত!

পণ্ডিত বলিল, হঁ হে হঁ, শুন, ওই জীবনে ছোঁড়া—পতিত করলাম উয়াকে ষোল-আনায়, কাল ইয়ার মজলিস হবেক এইখানে, শুনে রাখ।

সংবাদটা শুনিয়া পরমানন্দে আর-একবার হাসিয়া ডাক্তার বলিল, ঠিক হঁইছে, মানে-কথা, কাশীতে বিয়ে করে এসেছে, তা ত বেটেই, তা-ছাড়া মানে-কথা, বিত্যেপ্ আজ-কাল উয়ার একটুকু

বেড়েছে। এই দেখ না, এই সেদিন, মনে আছে ত পণ্ডিত, আমার সেই পাঁঠি-ছাগলটোর পা খোঁড়া করে দিলেক্ ঠেঙ্গাই, শুধু-শুধুই হে পণ্ডিত! মাইরি শুধু-শুধু—মিছাই। আবার উল্টো বলে কি না, উয়ার শাক-বাড়ীতে ঢুকেছিল,—আ মলো যা! তুর শাক-বাড়ীতে আমার পাঁঠি-ছাগল ঢুকতে কেনে যাবেক্ রে বাপু! আবার শুধু তাই লয়, এই সেদিন, মানে-কথা, বিশু কামার এলো আমার কাছকে, বল্লেক ছেলেটার প্যাটে বাজছে ডাক্তার, একশিশি ওষুধ দাও। আমি কিন্তুক বাবা, লগদ পয়সা ছাড়া কারবার করি না। বল্লম, ফেল্ আটগণ্ডা পয়সা, দিছি ওষুধ। বল্লেক পয়সা নাই। আমি বল্লম, ওষুধও নাই। ওই জীব্‌নে ছিল কাছে দাঁড়াই, বললেক, দাও ডাক্তার, ওষুধ দাও, পয়সা না দেয় আমি দিব। বাস্! উয়ার কথা শুনে, দিলম ওষুধ। এইবারে লে, তুঁই শালা আদায় কর্ পয়সা! মানে-কথা, সেদিন বলতে গেলম জীবনেকে, বলি, দে পয়সা! মানে-কথা, শুনলে অবাক হবে পণ্ডিত, তেড়ে মারতে এলো!—ই সব মানে-কথা, বল ত বিত্যেপ্ লয় তো কি!

হরি পণ্ডিত বলিল, বটেই ত!

ডাক্তার তখনও থামিল না। বলিতে লাগিল, বিয়ে ত সবাই করে রে বাবা, তাই বঁলে অমন পায়রার মতন মুখোমুখি দিনরাত বসে বসে বকম্ বকম্ করতে দেখেছ কেউ? বিয়ে হঁয়ে গেল আজ দু'বছর, তা' আখুনও আবার এত কিসের? জোর তিন মাস, না হয় ছ'মাস, না হয় এক বছরই ধরলম্, মানে-কথা, বিয়ে ত আমাদেরও হঁইছে হে, আমরা ত আর রামডেঙ্গো ফতে-খাঁ লই—

কিন্তু এসব কথা মাধু গোঁসাইয়ের ভাল লাগিতেছিল না। মালসায় চড়ানো আলুর অম্বলটা উনানের উপর বক্ বক্ করিয়া

ফুটিতেছে, একটা আলু টিপিয়া দেখিয়া এইবার সেটা নামাইয়া লইলেই হয়। ডাকিল, ঠাকুরঘরের উপরে তুরা কে কে আছিস রে—কান্ত, নঁদা! আয়, আয়, সব নেমে এসে পাত-টাতগলা ধুইবারে,—নিয়ে, লে সব ঝপাঝপ বসে যা!

কান্ত, নন্দলাল, ভুতো, পঞ্চু প্রভৃতি সকলেই হুড়মুড় করিয়া নামিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। গ্রামের দু'একজন লোকও তখন একে একে জড় হইতেছিল, কিন্তু এই শীতের রাত্রে একেই ত হাত-পাগুলা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে, তাহার উপর ঠাণ্ডা হিমের মত ভৈরব-গড়ের জল আনিয়া শালের পাতাগুলা ধুইয়া ফেলা, সে এক দুঃসাধ্য কর্ম্ম। ছোকরাদের মধ্যে এ-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। কান্তর বয়স একটুখানি বেশি এবং সে দেখিতেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান, কাজেই সকলে মিলিয়া তাহাকেই ঠেলিয়া দিল।

কান্ত একবার মাখনার সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাইল, মাখনা উপস্থিত থাকিলে এসব কাজ বড় একটা কাহাকেও করিতে হয় না। জিজ্ঞাসা করিল, সে মাখনা হতভাগা গেল কোথা, মাখন ?

ডাক্তারের বকুনি তখনও থামে নাই। হরি পণ্ডিত পিছন ফিরিয়া বলিল, মাখনা গেইছে বামুন ডাকতে।

মাংসের কড়াইটা উনান হইতে নামাইয়া জনার্দ্দন তামাক সাজিতেছিল, ছোকরাদের দিকে একবার ফিরিয়া তাকইতেই ব্যাপারটা সে বুঝিতে পারিল। বলিল, থাম্, থাম্, আমি যেছি। তুদের কাহুকে যেতে হবেক নাই, ভুস্‌কুম্‌ড়োগলা সব! ভাত মারতেই বাহাদুর!

পিতলের কলসী ও শালপাতার তাড়াগুলা ঘাড়ে লইয়া জনার্দ্দন পুকুরের দিকে চলিয়া গেল এবং মিনিট-দশেক পরে যখন

সে ফিরিয়া আসিল, দেখা গেল অবস্থা তাহার অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। একটা কাঁধের উপর জল-ভর্ত্তি কলসী, আর একটা কাঁধে ভিজা শালপাতার তাড়া। জল ঝরিয়া তাহার গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিখানা ভিজিয়া গিয়াছে। নন্দলাল তাহার কাঁধ হইতে পাতাগুলা নামাইয়া লইল, কলসীটা সে নিজেই নামাইল। শীতে সে কাঁপিতেছে দেখিয়া কান্ত হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কেমন জাড় জনাদ্দন ?

হুঁ, বড়ো জাড়াঁই গেল মাইরি। বলিয়া গায়ের গেঞ্জিটা খুলিয়া নিংড়াইতে নিংড়াইতে উনানের কাছে গিয়া আগুনের আঁচে সে তাহা শুকাইতে লাগিল। বেচারার অবস্থা ভাল নয়, আগে সে একটা কয়লার কুঠিতে ভাত রাঁধিত, সম্প্রতি তাহার সে চাকরী গিয়াছে, এখন তাহার দিন চলা ভার।

মাখনা ফিরিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে এই এত শীতের রাত্রেও লোকজনে ভৈরবতলার উঠানটা ভরিয়া গেল। এত লোক সমাগম মাধু গোঁসায়ের চক্ষে বড় ভাল বলিয়া বোধ হইল না। হরি পণ্ডিতের কাছে উঠিয়া গিয়া সে একবার তাহার কানে কানে ফিস ফিস করিয়া বলিল, দেখলে ? বলছিলে লোক হবেক নাই।

নিতাই ডাক্তার লোকগুলাকে একবার মনে মনে গুনিয়া লইতেছিল। কল্প চাটুয্যেকে সে দেখিতে না পাইয়া বলিল, হা-হে, কল্প চাটুজ্যে আসে নাই কেনে ?

আট দশ বছরের একটা মেয়ে বলিয়া উঠিল, কাকা আসতে লারলেক, এই থাল পাঠাঁই দিয়েছে।

কুঞ্জ সামন্ত হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, কেনে হে ডাক্তার ? কিছু পাওনা আছে নাকি ?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিল, না হে না, ই হাঁসির কথা লয়—

হেঁসো না মাইরি! আজ ছ'টি মাস হল, মানে-কথা, সেই উয়ার লাত্‌নির যখন 'বেলাড্‌ ডাইনেস্‌ট্রি্‌ক্‌' হয়, তখন তিনটি দিনের 'বিজিট্‌',—তিন আট্টে ধরে লাও কেনে—ছ্যাড্‌ টাকা। আখুনও বাকি। মানে-কথা, আর যদি কুন্নুদিন ডাকতে আসে তা'হলেই—

মাধু গোঁসাই আর সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, ওহে, তোমার মানে-কথা রাখো ডাক্তার, লাও, লাও, পাতা লাও, রাত পেভাত হঁয়ে গেল ইদিকে। ওরে নঁদা, ক'টা থাল এসেছে গুন্‌ দেখি একবার।

থালা গণনা শেষ করিয়া নন্দলাল বলিল, দশটা। আর এই যে, এইটো কার?—এই কাণাউঁচু থালাটা? বলিয়া সে থালাটা তুলিয়া ধরিল।

উটো জীবনকাকার। বলিয়া সাত-আট বছরের একটি মেয়ে পঙক্তি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হরি পণ্ডিত নিজের একটা পাতা পাতিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল, কেনে, কেনে? জীব্‌নের থাল কে পাঠালেক? তুখে কে আসতে বললেক?

মেয়েটি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাধু গোঁসাই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সে পাতা বিতরণ করিতেছিল, তাড়াতাড়ি পাতাগুলা হাত হইতে নামাইয়া, মেয়েটার হাতে ধরিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া তুলিয়া আগাছার জঙ্গলের দিকে ঠেলিয়া দিল। বলিল, এখন খেয়ে-দেঁয়ে লাও সব, তা-বাদে বলব, ইয়ার এনেক কাণ্ড আছে।

হরি পণ্ডিত বলিল, হঁ, সেই ভাল।

পাতার উপর গরম খিচুড়ি পড়িতেছিল, কাজেই মেয়েটার দিকে তাকাইবার মত অবসর তখন কাহারও ছিল না।

মাধু গোঁসাই নাকি খুব ভাল পরিবেশন করিতে পারে বলিয়া গ্রামের মধ্যে তাহার একটা সুখ্যাতি আছে, তাই একদফা খিচুড়ি পরিবেশনের পরমুহূর্ত্তেই মাংসের বাটিটা সে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া সগর্ব্বে পঙক্তির ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল।

ভিজা গেঞ্জিটা উনানের গায়ে শুকাইতে দিয়া জনার্দ্দন সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। জীবনের ভাইঝি আসিয়া অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে কহিল, জ্যোঠা, আমাদের থাল্‌টো—

জনার্দ্দন একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া তাহাদের সেই কাণা-উঁচু থালাটার উপর খানিকটা খিচুড়ি ও কড়াই হইতে খানিকটা মাংস তুলিয়া দিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, যা, যা,—চট্‌ করে পালা—পালা ইখান থেকে!

ক্ষুধার্ত্ত মেয়েটাকে বেশি কিছু বলিতে হইল না, গরম থালাটা সে যথাসত্বর দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।

কিন্তু জনার্দ্দনের এই গর্হিত আচরণ মাধু গোঁসাইয়ের চোখ এড়াইল না। পঙক্তির মাঝে মাংস দিতে দিতে সে চেঁচাইয়া উঠিল, ই-টো কি হল? ই-টো কী তুর্ হ'লো জনার্দ্দন শুনি?

জনার্দ্দন বলিল, আঃ! তা হোক্, লেক্‌গো—একথাল খিচুড়ি বেটে, সোনা-দানা লয়!

দিলেক নাকি? বলিয়া খাইতে খাইতে ডাক্তার একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল। তাহারপর বলিল, মানে-কথা, গাঁয়ের ষোল আনা যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন ইটো তুমার অন্যায় হঁইছে জনাদ্দন! মানে-কথা, হেসে দিলেই ত চলে না, ইটো একটো সমাজ নিয়ে কথা হচ্ছে কিনা।

জনার্দ্দন বলিল, ওরা কি আজ কিছু রেঁদেছে মনে করছ ডাক্তার? না দিলে আজকার রাতটো ওরা না খেয়েই কাটাতো।

সে রকম অবস্থা হথো ত জানথম, বলি হঁ—না দিলেও কিছু খাবেক্‌।

হরি পণ্ডিত আপন মনে আহার করিতেছিল, এদিকে মনোযোগ দিবার অবসর ছিল না। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। জনার্দ্দনের দিকে ফিরিয়া দাঁত কট্‌মট্‌ করিতে করিতে বলিল, এঃ! ভারি দয়ার শরীল্‌ রে তুর্‌! উঁচ্‌বুক্‌ কোথাকার!

প্রসন্ন অধিকারী তাহার পাশেই বসিয়াছিল, বলিল, জনার্দ্দনের লিজের ভেতরেও যে আছে, বলতে গেলে এখুনি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙতে হয়।

কান্ত বলিয়া উঠিল, কয়লা-কুঠির সেই খিরিস্তান্‌ ম্যানেজারের ঘরে রাঁধতো, সে আর কে না জানে?

ডাক্তার হাসিতে হাসিতে বলিল, মানে-কথা আমার ত আর কিছু জানতে বাকী নাই! কয়লাকুঠির সবাই সমান। আমার সেই পিসতুতো বুনের বিয়ে দিয়ে এলম, কয়লা-খাদের কাছেই বেটে সে গাঁটো, মুরগী-কুঁখুড়ির দাম বলে একটাকা-পাঁশিকে। মানে-কথা, তখনই জানলম—খাদের বাবুরা সব খেঁয়ে খেঁয়ে দামটো বাড়াইছে আর-কি!

আলুর চাটনি পড়িয়া গেল।

ডাক্তারের নিরীহ ঘোড়াটি বকুলতলায় দাঁড়াইয়া মাটিতে পা ঠুকিয়া মশা তাড়াইতেছে।

তাহারই অনতিদূরে তের-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় তাহার সুন্দর মুখে নাকের নোলকটি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, গায়ে একটা লাল-রঙের রেশমী র‍্যাপার

জড়ানো। মেয়েটিকে দেখিয়া তাহার বয়স অনুমান করা কঠিন। মনে হয়, তের-চোদ্দর চেয়ে বেশি, নদী যেন ভাদ্রের পূর্ব্বেই ভরিয়া উঠিয়াছে!

সেদিকে সর্ব্বপ্রথমে জনার্দ্দনের নজর পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল, উখানে দাঁড়াই রইছিস যে রাণী? থাল এনেছিস?

রাণী মুখে কিছুই বলিল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে, থালা সে আনে নাই।

যাঁহারা আহারে ব্যাপৃত ছিলেন, রাণীর নাম শুনিয়া প্রায় সকলেই একবার করিয়া সেইদিক পানে তাকাইলেন। কান্তর পাতায় তখন সবেমাত্র আলুর চাটনি পড়িয়াছে, একখণ্ড আলু মুখে দিয়া রাণীর দিকে তাকাইয়া সে তাহার জিহ্বা ও তালুর সংঘর্ষে বিকট একটা শব্দ করিয়া উঠিল।

রামচরণ সান্ন্যালের ছোকরা-ভগ্নিপতি বিদেশী মানুষ, নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে, সেও একবার এই মেয়েটির দিকে তাকাইয়া মাংসের একটা টুকরা চিবাইতে চিবাইতে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, কে হে? বেশ ত মেয়েটি!

ডাক্তারের মুখের কাজ অতিশয় দ্রুতবেগেই চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহা বন্ধ হইয়া গেল। কি জানি কেন, একটি কথাও সে বলিল না, চুপ করিয়া আবার খাইতে লাগিল। কানাই হালদার বসিয়াছিল বকুলতলার কাছাকাছি, রাণীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, তুঁই ত ইখানে বসে বসে খাবি নাই রাণী? যা থাল নিয়ে আয় গা।

জমি-জমা সংক্রান্ত কি একটা ঘরোয়া ব্যাপার লইয়া দিনকয়েক আগে রাণীর মায়ের সঙ্গে হরি পণ্ডিতের একটুখানি বচসা হইয়াছিল, তাই সে একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াই গম্ভীরভাবে নতমুখে খাইতে লাগিল।

কিন্তু এই এতগুলা লোকের সহৃদয় মন্তব্য এবং চোখের চাহনি মেয়েটিকে এত বেশি বিচলিত করিয়া তুলিল যে, কাছে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার সমস্ত মুখখানা যে বিরক্তিতে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইত। দূর হইতে শীতের ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নায় ভাল দেখিতে পাওয়া গেল না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি না থাকিলেও নিরক্ষর জনার্দ্দন তাহা টের পাইল, এবং যখন সে দেখিল, থালা আনিতে যাইবার আগ্রহ তাহার মোটেই নাই, তখন সে ধীরে-ধীরে তাহার কাছে উঠিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছিলি রাণী? কিছু বল্‌ছিস নাকি?

রাণী তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, ডাক্তারবাবুকে ডাকছি।

কেনে বল দেখি?

রাণী বলিল, মাসীর খুব অসুখ।

জনার্দ্দন জিজ্ঞাসা করিল, কার? কাতু পিসির?

হাঁ, বলিয়া রাণী একটুখানি থামিয়া বলিল, খাওয়া হলে ডাক্তারবাবুকে একবার পাঠাঁই দিও আমাদে ঘরকে।

জনার্দ্দন হাঁকিল, ওহে ডাক্তার, কাতুপিসির অসুখ নাকি খুব বেড়েছে হে, তুমাকে একবার যেতে হবেক্ ভাই, খেঁয়ে উঠে।

রাণী এইবার একটুখানি জোরেজোরেই বলিল, আর পণ্ডিত দাদা, তুমিও একবার এসো—মা ডাকছে।

হরি পণ্ডিত এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল, আমাকে আবার কেনে? তুর্ মা ত সেদিন পষ্টই বলে দিলেক্, আমাদিকে উয়ার কুন্থ কাজেই চাই না—

ডাক্তার একটা মাংসের হাড় চিবাইতেছিল, কথাটার প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাড়াতাড়িতে ভুলিয়া সেটা গিলিয়া

ফেলিল। তাহার পর মিনিটখানেক সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল, যাবে, যাবে, মানে-কথা, আখুন্ আর উ-সব কেনে?

হরি পণ্ডিত রাণীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, তা তুমার কথা শুনে না-হয় গেলম্, আর রাণী যখন লিজে-থেকে এসেছে ডাকতে! কিন্তুক্, তুমি জান না ডাক্তার, এই কালভৈরব-বাবার পুজোটি আছে আমার হাতে, তা, সে পিথম্ দফায় ত একবার ধর, রাত-উছুরে উঠলম্, তা-বাদে জাড় নাই, রোদ নাই, বর্ষা নাই, বাদল নাই, বার-মাস তিরিশ-দিন ত সেই ভোরে একবার হলো চান,—তা-বাদে, ধর কেনে তুমি, কুথা ফুল রে, কুথা ব্যাল্‌পাত্ রে, কুথা চাল রে, কুথা চন্দন রে, সব ঠিকঠাক জোগাড়-যন্তরটি করে বসলম্ পাঠশালে, তা-বাদে পাঠশালের ছুটি হতে-না-হতেই আবার চান, তা' বাদে সেই ভিজে কাপড়ে এসে, তখনও পর্য্যন্ত ধর চাঁ খাবার জু নাই, টুক্‌ছেন্ জল পর্য্যন্ত যাবেক্ নাই প্যাটে,—করলম পূজো। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই এক গ্রাস খিচুড়ি সে প্রথমে খাইয়া লইল, তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল, তা একটি মন্তর ভুল হবার জু নাই, এতটুকু কুথাও বিন্তিরিজ্ হবার জু নাই,—হলেই ত বাবা জীয়ন্ত দ্যাব্‌তা, দিবেক্ ঢিপে-ঢাঁই ক'রে মাগ্-ছেলে হাব্‌ড়াঁই এক্কবারে গুষ্টিসুদ্দো!—দেখো বাবা, অপরাধ লিও না বাবা!—বলিয়াই হরি পণ্ডিত তাহার বাঁ হাতটি উচ্ছিষ্ট ডান হাতের কাছে লইয়া আসিয়া কপালের কাছ পর্য্যন্ত উঠাইয়া কণ্টকাবৃত বাবা-ভৈরবকে একটি প্রণাম করিল, তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, দ্যাখ, দ্যাখ, গায়ের রুঁয়াগলা সব দাঁড়াই উঠ্‌ল হে ইয়ার-মন্তে! এই বলিয়া সে তাহার রোমাঞ্চিত হস্তের দিকে ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, তাথেই রাণীর মাকে সেদিন বল্‌লম বলি কাতু পিসি, তিন বিঘে জমি ত রইছে বাবা-

ভৈরবের নামে, তার মধ্যে ড্যাড়্ বিঘে আমি চষ্‌ছি, আর ড্যাড় বিঘে চষ্‌ছ তুমি,—কিন্তুক্ হাঙ্গাম্-হুজ্জুৎ যা কিছু এই আমি-শালার ঘাড়েই সব, তাথেই বল্‌ছিলম্ পুরোপুরিই উ ড্যাড়্ বিঘে সুদ্দো দিঁয়ে দাও আমাকে,—চোত্-পরবের গাজনের দিনে ঘিয়ের পিদীপটো না-হয় আমিই দিব।—এই ত গেল কথা, তা না হলে মাতু-পিসি কাতু-পিসির সঙ্গে আমার যে কিছু ইয়ে আছে, তা নাই। ও বাবা, তুমাদের খাওয়া সব হঁয়ে গেল নিকি হে ?—এই যে, এই যে, দাঁড়াও টুক্‌ছেন, কথা কইতে কইতে—এই আমারও, এই মেরে দিঁয়েছি। বলিতে বলিতে আলুর চাটনির সহিত মিশাইয়া বাকি খিচুড়িটুকু হরি পণ্ডিত অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত সপাসপ শব্দ করিতে করিতে মিনিটখানেকের মধ্যেই তুলিয়া ফেলিল।

আহারাদি শেষ হইলে পর, ভৈরব-গড়ের জলে হাতমুখ ধুইয়া নিতাই ডাক্তার তাহার ঘোড়াটিকে ঘরে রাখিতে গেল। ঠাণ্ডা জল স্পর্শ করিয়া হরিপণ্ডিতের সর্ব্বাঙ্গে তখন কাঁপুনি ধরিয়াছিল, বলিল, আমি এই মাধুর কাছে তামাকটো একটান টানি, তুমি তাকত্তে ফিরে এসো ডাক্তর।

ও-পাড়ার সুরেন চাটুজ্যে হরিপণ্ডিতের সমবয়সী, সমধর্ম্মী বলিলেও চলে। কপালে তিলক-ফোঁটা, মাথায় টিকি। বছর-দুই আড়াই-এর ছোট মেয়েটাকে কোলে লইয়া তিনি খাইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়েটা আসিবার পথেই ঘুমাইয়া পড়ায় আজিকার রাত্রের এই আহারটা তাঁহার বিশেষ সুবিধার হইল না —এই কথাটি বলিবার জন্য হাতমুখ ধুইয়া হরি পণ্ডিতের কাছে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরি পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে বলিল, কি বল হে সুরেন, কেমন হলো আজকে ?

সুরেন চাটুজ্যে বলিলেন, বেশ, বেশ, উত্তম। কিন্তুক্ এই বিটিটো আমার সব দিলেক্ লষ্টো করে। সন্ধ্যে থেকে—'বাবা মাস খাব, মাস খাব' বলছিল, তাথেই উঠোই নিয়ে এলম, বলি, খাওয়াঁই আনব,—কিন্তুক্ এমন ঘুম ঘুমোলেক্ যে, আমাকে-সুদ্দো খেতে দিলেক্ নাই ভাল করে—দাও হুঁকোটো।

মাধু ও জনার্দ্দন এইবার তাহাদের নিজের আহারের বন্দোবস্ত করিতেছিল। হুঁকাটা টানিতে টানিতে সুরেন চাটুজ্যে একবার তাহাদের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু বাড়লো নিকি হ্যা? পাঁঠাটো ত বড়-পারাই ছিল শুনলম।

মাধু গোঁসাই বলিল, কোথা পাবে চাটুয্যে! লোকজনও যে বেশ হঁইছিল। আর থাকে?

চাটুজ্যে তাঁহার ঘুমন্ত মেয়েটার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, তাই বলছিলাম যদি থাকে ত দু-এক-কাঁটা দিথে, এই মেয়েটো সকালে উঠলে দিথম্ খাওয়াঁই, খাব খাব করছিল—

জনার্দ্দন বলিল, তাই দাও হে মাধু, আমার ভাগ থেকেই না-হয় কেটে দাও একটুকুন্!

মাধু একটা শালপাতায় মুড়িয়া খানকতক মাংসের টুকরা সুরেন চাটুজ্যের হাতে দিয়া বলিল, লাও, নিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি চাটুজ্যে, তা না হলে আবার কত লোক—

চাটুজ্যেকে সে-কথা বলিতে হইল না। তা হলে আসি হে হরি! বলিয়া সুরেন তাঁহার এককোলে ঘুমন্ত মেয়েটাকে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া মাংসের পাতাটি ডান হাতে লইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিলেন।

মোড় ফিরিয়া তিনি চোখের বাহিরে চলিয়া গেলেন। মাধু গোঁসাই হাসিতে হাসিতে বলিল, আমাকে কি তেমনি পরিবেশনে' পেঁয়ে গেইছ হে পণ্ডিত—এই দেখ। বলিয়া ঢাকা-দেওয়া মাংসের

কড়াইটা তুলিয়া দিতেই পণ্ডিত দেখিল, অনেকখানা মাংস তখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে।

হরি পণ্ডিত সহাস্যে কহিল, এই সময় তা হলে তাড়াতাড়ি, তা না-হলে আবার ডাক্তর চলে আস্‌বেক্—বুঝলে? তোমার খুড়িকে আমি বলেও এসেছিলম্, দেখগা হয়ত এখনও ঘুমোয় নাই।

কথাটা তাহার শেষ হইতে-না-হইতেই ডাক্তার আসিয়া ডাকিল, চল হে পণ্ডিত, দেখেই আসা যাক রুগীটোকে—

মাধুকে চোখ টিপিয়া দিয়া হরি পণ্ডিত উঠিয়া দাঁড়াইল। মাধু শালপাতার তাড়াটা কড়াই-এর উপর তাড়াতাড়ি ঢাকা দিয়া বলিল, খুড়ির কাছে পান-জল খেঁয়েই আমরা ঘর যাব পণ্ডিত, তুমি যাও।

পথে আসিয়া হরি পণ্ডিত বলিল, আমাদের মাধু আর জনার্দ্দন না থাকলে আজ দেখছি কিছুই হতো নাই ডাক্তার।

ডাক্তার বলিল, মানে-কথা ই-সব কাজে উয়ারা এক-একটি 'কামপিটেন্' লোক।

এই সব আলোচনা করিতে করিতে তাহারা রোগী দেখিতে চলিয়া গেল।

রাস্তার অনতিদূরে ছোট একটা পুকুরের পাড়ে, বাসক ও বোয়ানের কতকগুলা ঝোপ-জঙ্গল পার হইয়া বহু পুরাতন প্রকাণ্ড একটা দোতলা দালানের ধ্বংসাবশেষ। সুমুখে খিলান্‌দার সুড়ঙ্গের মত প্রবেশ-পথের মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ দেয়ালটাকে ফাটাইয়া চৌচির করিয়া দিয়াছে। তাহার পরেই দুইটা বড় বড় ঘরে গরু-বাছুর বাঁধা থাকে, বাহিরের শুভ্র

জ্যোৎস্নার আলো সুমুখের সুড়ঙ্গ-পথ অতিক্রম করিয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়া সূচিভেদ্য সেই ভীষণ অন্ধকারে গরুবাছুরগুলা হুটোপুটি আরম্ভ করিয়া দিল। ডাক্তার বলিল, টুক্‌ছেন্ সামালে আসবে পণ্ডিত, আঁদার্‌টো যে বড়ো বেশি লাগছে হে!

মাতুপিসির ঘরখানা দুজনের মধ্যে কাহারও অচেনা নয়। তবে, সচরাচর যাওয়া-আসা নাই, এই যা। উভয়েই কোনরকমে সেই অন্ধকার ব্যূহ ভেদ করিয়া একটা চত্বরে আসিয়া পড়িল। সুমুখে মাথার উপরের খানিকটা ছাত ধ্বসিয়া গিয়া সেখানে জ্যোৎস্নার আলো প্রবেশ করিতেছিল। পাশেই ছোট একটা গর্তের মত কুঠরির মধ্যে ভিকু-কত্তার শ্বাসতলানো কাশির শব্দ পাওয়া গেল। বয়স তার আশী পার হইয়া গেছে, গ্রামে বোধ হয় তাহার চেয়ে বৃদ্ধ আর কেহই নাই। হাঁপানীর রোগী বলিয়া দুর্ব্বহ একটি বোঝার মত পাশের এই অন্ধকার ঘরে পড়িয়া থাকে। সম্পর্কে কাকা হইলেও তাহার উপর মাতুপিসির অবহেলার ত্রুটি নাই। তবু সে মরেও না, সারিয়াও ওঠে না। তাহার দাদার মত পেটে না খাইয়া জীবনে নাকি সে নিজেও প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এবং তাহারই মায়ায় প্রাণটা তাহার দেহ হইতে সহজে বাহির হইতে চায় না, ইহাই নাকি জনপ্রবাদ। কিন্তু সে যাহাই হউক, হরি পণ্ডিত চুপি চুপি বলিল, এই একটো পাকা ফলারের জোগাড় আছে ভায়া!

অকস্মাৎ পাশের একটা অন্ধকার গলির ভিতর হইতে মাতুপিসির স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এই যে বাবা, তোমরা এলে? এসো বাবা এসো, নিতাই এসো! রাণীকে পাঠালাম। বলি, যা রাণী, ডাক্তরকে একবার ডেকে আন্ গা, আর তুর পণ্ডিতদাদাকে।

হরি পণ্ডিতের ভয় হইল, পাকা ফলারের কথাটা বোধকরি সে শুনিতে পাইয়াছে। তাই সে তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের কথাটাকে পাল্টাইয়া লইয়া বলিল, হঁ পিসি, তাই বলছিলম ডাক্তরকে, বলি, এমন পাকা ছাদ, ধ্বসে পড়ল কেমন করে কে-জানে!

মাতুপিসি তাহাদের আগে আগে তাড়াতাড়ি খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, আমার কত্তাবাবার আমলের ঘর, আর কতকাল থাকবেক! ও রাণী! আলাটো একবার ওইখানে দেখা মা!

উপরে উঠিবার ভাঙা একটা সিঁড়ির পাশের ঘর হইতে বাঁহাতে একটি কেরোসিনের 'লম্ফ' লইয়া রাণী বাহির হইয়া আসিল।

সেই আলোতে পথ দেখিয়া, আরও দুইটা দরজা পার হইয়া আসিয়া, রোগীর দরজার কাছে সকলে গিয়া দাঁড়াইতেই, মাতু চীৎকার করিয়া ডাকিল, লক্ষীনারাণ! ও বাবা লখাই! আয় বাবা, বেরেঁই আয় একবার!—নিতাই এসেছে, তুর্ মাসিকে একবার দেখা ভাল করে।

মাতুপিসির একমাত্র বংশধর এবং উত্তরাধিকারী লক্ষীনারাণ, তাহার তিনটি কন্যা ও রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া পাশের ঘরেই শুইয়াছিল। বয়স তাহার পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়, কালো পাথরের মত গায়ের রং, দেখিয়া মনে হয় না যে রাণীর ভাই।

পাশের ঘরে গোঁ গোঁ করিয়া কেমন যেন একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ হইল এবং মিনিট-খানেকের ভেতর হড়াম্ করিয়া দরজার খিল খুলিল, কিন্তু কাহাকেও বাহির হইতে দেখা গেল না। মাতু আবার ডাকিল, আয় বাবা, আয়—

ভিতর হইতে লক্ষীনারাণ চেঁচাইয়া উঠিল, লার্‌ব, লার্‌ব, লার্‌ব, হারমজাদী শালী কুথাকার! আমি যেতে লার্‌ব এই দু'ফর রেতে।—কেনে? সেই ভুস্‌কুম্‌ড়ো বিটি কুথা তুর্, বিটি?—

রাণী? আমি লারব। বলিয়া দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া লক্ষীলারাণ তাহার মুখখানা একবার বাহির করিল, কিন্তু হরি পণ্ডিতেব সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র তাহার সেই কালো মুখখানি দরজার আড়ালে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং ভিতর হইতে পুনরায় খিল বন্ধ হইবার শব্দ হইল।

হরি পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিল, খেতে যাস নাই কেনে রে আজ ভৈরবতলায়, লখাই?

এইবার কি ভাবিয়া, সশব্দে আবার সে দরজার খিল খুলিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণে লালরঙের ময়লা একটা লুঙ্গি, গায়ে ততোধিক মলিন একটি রঙিন কোর্ত্তা, মাথার চুলগুলা কপাল ঝাঁপাইয়া চোখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। হরি পণ্ডিতের মুখের পানে তাকাইয়া তাহার প্রশ্নের কি একটা জবাব দিতে যাইবে, এমন সময় লক্ষীলারাণের নজর পড়িল রাণীর দিকে। ঘরের ভিতর রোগীর শিয়রের পাশে তেলের প্রদীপ একটা জ্বলিতেছিল বটে, তবু সে 'লম্ফটি' হাতে লইয়া দরজার চৌকাঠের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লক্ষীলারাণ আর কোনও কথা না বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে রাণীর গায়ে-জড়ানো 'র‍্যাপারে'র খুঁটে সজোরে একটা টান দিয়া বলিয়া উঠিল, খুলে দে। আমার গায়ের কাপড় খুলে দে বল্‌ছি, এখনও বলছি খুলে দে। এঁঃ! মাইরি আর-কি? আমি শালা মরি জাড়ে, আর উ এইটো নিয়ে বেড়াক—

রাণী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। রাগে কিছু বলিতেও পারিল না, হাত হইতে আলোটা নামাইয়া গায়েব কাপড়টা তৎক্ষণাৎ সে খুলিয়া ফেলিয়া লক্ষীলারাণের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিল। সমাগত আগন্তুক দুজনের মধ্যে লক্ষীলারাণের প্রকৃতির কথা কাহারও কাছে অবিদিত ছিল না, কাজেই তাহারা কোনও

কথা না বলিয়া চুপ করিয়াই রহিল, এমন কি ছেলের ভয়ে মাতু পিসির মুখ দিয়াও একটি কথা বাহির হইল না। গায়ের কাপড়টা ফেলিয়া দিয়াই রাণী চলিয়া গেল।

লক্ষীনারাণ সেটা তাহার কোমরে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, চল তবে চল, মাসিকে দেখবে চল হে ডাক্তর! কি আর দেখবে? শালী ত তুললেক্ বলে পটল!

কথাটা শুনিয়া হরি পণ্ডিতের হাসি পাইল, এবং তাহা দমন করিবার জন্যই বোধকরি হঠাৎ সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা লখাই, তুঁই যে লিলি উ গায়ের কাপড়টো কেড়ে—কই গায়ে ত দিলি নাই? কুমোরে বেঁড়াই রাখলি—

লক্ষীনারাণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিল, আমাকে ত জাড় লাগে না পণ্ডিত! আমি ওই পুকুরের ঘাটে ডুব দিতে পারি এই রেতে, লাগাও তগ্ড়ার! মাইরি বলছি!

বিছানার উপর কঙ্কালসার রোগী তখন জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিল, লক্ষীনারাণের চীৎকারে সে একবার গোঁ গোঁ করিয়া অস্পষ্টভাবে কি যেন বলিয়া উঠিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, কাতুপিসির অসুখ কদ্দিন?

লক্ষীনারাণ বলিল, ক্যা জানে ত!

লক্ষীনারাণকে কিছু বলাও যায় না, বলিলে হয়ত এই আগন্তুক দু'জনের সুমুখেই তাহার মুখের বাঁধন খুলিয়া যাইবে এবং তাহা বিশেষ শ্রুতিমধুর হইবে না, এই ভাবিয়া মাতুপিসি চুপ করিয়াই রহিল।

হরি পণ্ডিতের সহিত মাতুপিসির একটুখানি গোপন পরামর্শের প্রয়োজন ছিল, তাই সে তাহার কাছে গিয়া বলিল, আয়ত বাবা হরি, তুর্ সঙ্গে আমার টুক্ছেন্ মফঃস্বলি আছে, উয়ারা তা-কত্তে দেখুক্।

বলিয়া চৌকাঠের উপর হইতে ধূমায়মান লম্ফটি তুলিয়া লইয়া মাতুপিসি আগে আগে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল, হরিপণ্ডিত তাহার পশ্চাতে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু উপরে উঠিবার ভাঙা সিঁড়িটা পার হইয়া, অনতিদীর্ঘ অপ্রশস্ত একটা গলির মধ্য দিয়া বায়ুলেশহীন নিতান্ত ছোট যে-ঘরখানির দরজায় আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল, 'মফঃস্বলি'র এমন প্রশস্ত স্থান সচরাচর কাহারও নজরে পড়ে না। ক্ষণকাল পূর্বে অন্ধকার এই কক্ষের মধ্যে কিসের যেন একটা শব্দ হইতেছিল, আলোর ছটা এবং মানুষের পায়ের শব্দে সহসা তাহা বন্ধ হইয়া গেল। হরিপণ্ডিত অত্যন্ত ভীতু মানুষ, চৌকাঠ ডিঙাইতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না, মাতুপিসি বলিল, উ-সব ইঁদুর-ছুঁচোর দৌরাত্মি, আয় বাবা, আয়। রেতে আমি এই ঘরে শুই হরি, তুর্ কুনু ভয় নাই, আয়।

ঘরের দেয়াল ঘেঁসিয়া সারি সারি মাটির হাঁড়ি কলসি সাজান, টিনের কয়েকটা সাবেক-কালের প্যাঁটরা, এককোণে কাঠের একটা সিন্দুক কি তক্তাপোষ কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, তাহার উপর বিছানা পাতা ছিল: পণ্ডিত গিয়া তাহারই একপাশে চুপ করিয়া বসিল বটে, কিন্তু যাহার সহিত মাত্র এই সে দিন রীতিমত বচসা হইয়া গিয়াছে, আজ আবার তাহাকেই এতদূর ডাকিয়া আনিয়া নিভৃতে পরামর্শ করিবার এমন কি প্রয়োজন ঘটিয়াছে, সেই কথাটাই ভাল করিয়া সে ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। যাহাই হউক, মিনিট কয়েকের মধ্যেই তাহার সে-উদ্বেগ কাটিয়া গেল।

কথাটা কেমন করিয়া উত্থাপন করিবে, মাতুপিসি এতক্ষণ মনে মনে তাহারই পাঁয়তারা ভাঁজিয়া লইতেছিল, অবশেষে চিবাইয়া চিবাইয়া ধীরে-সুস্থিরে ব্যাপারটা সে বলিতে আরম্ভ

করিল। যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম যাহাই হউক, ঘটনাটি নির্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে পারিলে, হরিপণ্ডিতের লাভ আছে। বাবা-ভৈরবের পূজার দরুন তাহার হক্কের পাওনা সেই দেড় বিঘা নিষ্কর জমি ত আছেই, এমন কি, এই সঙ্গে আরও এক-আধ বিঘা যে ঘরে না ঢুকিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে! পয়সা-ওয়ালা কৃপণ মাগীর এই শাস্তিই ভাল! অথচ, ঘটনা যৎসামান্য এবং শাস্ত্রসম্মত।

মাতুপিসি বলিল, হেই বাবা, তুর্ হাতে ধরছি বাবা!

পণ্ডিত হাঁ-হাঁ করিয়া নিষেধ করিল। বলিল, ই আর এমন বেশি কথা কি পিসি? এক্‌টো ছেড়ে এমন পঞ্চাশটো হক ই-গাঁয়ে, কুন্নু শালা ট্যাঁ-ফোঁ করে, একা রইল এই হরি শম্মা! বলিয়া সে তাহার বুকে হাত দিয়া নিজেকে ভাল করিয়া দেখাইতে গিয়া বিষম একটা বিপদ বাধাইয়া ফেলিল। তাহার প্রসারিত দক্ষিণ হস্তটি সজোরে তাহার বসিবার সিন্দুকের উপর আসিয়া পড়িতেই, পায়ের নীচে ঝন্ ঝন্ করিয়া আধ-অন্ধকার সেই কক্ষের মধ্যে সে-যেন এক প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া গেল। শব্দ শুনিয়া হরিপণ্ডিত আতঙ্কে একেবারে ডিগ্‌বাজী খাইয়া সিন্দুক হইতে মেঝের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাতুপিসি খপ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, চুপ! উ কিছু লয় হরি! বাসন পুরা আছে সিন্দুকটোতে, আমাদের সেই বহুক্কালের সাবেকের বাসন বাবা, সেই বাটিগুলা হুড়মুড় করে পড়ে গেল, আর কিছু হয় নাই। বোস।

তাও ভাল! ইহা যে কাঁসার বাসনের শব্দ, কথাটা শুনিয়া তাহার প্রাণের আশঙ্কা কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইয়া গেল। শব্দ থামিতে দেরি হইল না। ঘুঁসির চোটে এক থোক সাজান বাটির উপর পিতলের একটা কলসি পড়িয়াছিল মাত্র।

পিসির বিছানার উপর পণ্ডিত আবার চাপিয়া বসিল ; বলিল, কিন্তুক পিসি, তা হলে বিয়ের দিনটো কবে হল ?

মাতুপিসি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আ আমার কপাল ! অত আর সময় পেলোম কুথা বাছা ! তাহার পর গলার আওয়াজ একটুখানি খাটো করিয়া এবং তাহার সেই গোল-পানা কালো মুখের ডাগর চোখ দুইটা একটুখানি বিস্তারিত করিয়া কহিল, কাল সইন্ধ্যাবেলায় যেছিল এই কুলি-বাগে—ঘোড়ায় চেপে পেরেঁই। আমি ডাকলম ওই বাসক-ঝোপ হতে, বলি, ও বাবা নিতেই, শুন ! তাবাদে—যাকগো, উদিকে তুই নিশ্চিন্দি থাকগা লিব্‌ভাব্‌নায়, নিতাই আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে গেইছে। জনাদ্দনের ফুল-ব্যল্‌পাতা দিলম, আর ইদিকেও দিলম পাঁচ-কুড়ি !—আর বাকি রইল, ছ্যাখ কেনে বাবা, হিসেব করে পাঁচ শ টাকায় ককুড়ি হয়—

পণ্ডিতের মগজটা হঠাৎ যেন একবার চম করিয়া উঠিল। পাঁচশ-পাঁচকুড়ির ঝঙ্কার তাহার দেহাভ্যন্তরের পাঁচটা ইন্দ্রিয়কেই যেন একবার সজাগ করিয়া দিল। বলিল, দিলে ত মানলম পিসি—এনেক। কিন্তুক, ডাক্তারকে একটো কথা অমুনি বলঁ-ই লিলে নাই কেনে, যে, হুঁ, লিছি যখন তুমার বিটিকে বাবু, তখন ফেল্‌ব নাই কুন্নুদিন ! বিয়ে না হয় কল্লেক কল্লেক, কুলিনের ছেলে, অমন একটো ছেড়ে পাঁচশটো করুক কেনে ! কুছ পরোয়া নাই !

মাতুপিসির বাতের শরীর। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না, কাজেই মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া পড়িল এবং ডান হাতের আঙুল দিয়া মাটির উপর আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলিল, তাই বল বাবা, কম পয়সায় অমন কুলিনটি আমি পাই কুথা ? আকুলে ভাসাই দিতে পারি আখুনি বিটিটোকে

কিন্তুক আমার লক্ষ্মীলারায়ণ বলছে, শালী হারামজাদী, কুল হারাতে তুঁই পাবি নাই—পাবি নাই, আমার বিটি-ব্যাটারা কি করবেক তাহেলে বল। আবার টাকাও খরচ করতে দিবেক নাই,—বলছে, আমি খাব কি মাগ-ছেলে নিয়ে।

তা লক্ষীলারাণ ত হক-কথাই বলেছে পিসি, তাথে তুমি রাগো আর রুষো! বিটির দায়ে যদি ফতুর হলে, তাহলে উ কি করবেক? ইও ত কথার মতন কথা।

মাতুপিসি বলিল, হঁ বাবা, তাই বলি, কুথা আর বিটিটোকে দিই বল বিত্থাশ-বিভুঁয়ে, ই বরং রইলো চোখের কাছে, দেখতে পাব দিনরাত। আর একটি সুখ, না আছে শ্বশুর, না আছে শাশুড়ী! কুথা হয়ত চাট্টি মুড়ির লেগে শ্বশুর শাশুড়ির কাছে আঁচল পেতে দাড়াই রইথো গা, তারচেঁয়ে ই বাবা লিজের ঘর, লিজের দুয়োর, লিজেই ঢুকলম, লিজেই বাড়লম, হুস্‌মুসোঁই চারটি লিজেই লিলম—যা খালাস। সতীন বলতে এলো, দিলেক উ জুম্‌ড়ো-মুখীর গালে দুটো ঠোনাই! এই বলিয়া কন্যার ভবিষ্যতে এত বড় একটা জয়ের আনন্দে পিসি একবার না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

লাও, উঠ! কিছু ভাবনা নাই পিসি, আমরা দিন-খেন সব আজকেই ঠিক করে দিয়ে যেছি—লাও। বলিয়া হরিপণ্ডিত তাহার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাতুপিসি উঠিল। জ্বলন্ত ডিবেটি আবার সে তাহার হাতে তুলিয়া লইয়া পথ দেখাইয়া চলিল। গায়ে মাত্র একফেরতা একটা কাপড় জড়ান, শীতে এবং আনন্দে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পিসি বলিল, এই ঘরকেই ডাক তাহেলে নিতাইকে বাবা, পাঁজিটো এনে দিঁয়ে আমি না-হয় এই গলির হোই-পাশে ঢাকামুকি দিঁয়ে টুকছেন দাঁড়াই।

পণ্ডিত গলিতে নামিয়া হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, তাহেলে অই হবেক পিসি, কিন্তুক ভাঙাচুরো ভৈরব বাবাজীর ড্যাড়্‌ বিঘে আর কেনে, কথায় বলে, ভাঙা মাসের আর কটা দিন! তুমার ওই ঘুড়ঘুড়ের মাঠের আড়াই-বিঘের কিত্তেটিই দিও, হোই যে সেই বুজির-বাঁধের লাগাও—ঠিক নামুতেই।

তাই লিস। তুঁই দে দেখি কাজটো এগুতে চুকোঁই বাবা! তুর বেটা হক!

হরিপণ্ডিত বলিল, সেই আশীর্বাদ কর পিসি, তুটো-চারটে চাই না, কানা-খোঁড়া একটো হক, বংশটো থাকুক।

আলো হাতে লইয়া গলির মধ্যে মাতুপিসি হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, তবে আর বলছি কি বাবা, দিনরাত আমি ঐ বরই ত মাগছি বাবা কাল-ভৈরবের কাছে। বলি, দাও বাবা, আমার লখাই-এর একটি দাও, আর আমাদের হরির একটি; লখাই-এর আমার উঠৌউটি তিন-তিনটি বিটি হল, বউকে বুড়ো-শিবের কবজ দিলম, বাবা ডেলাই-চণ্ডির মাতুলি দিলম, আবার বলছি আমার এই আইবুড়া বিটিটোকে দি খালাস করে এগুতে, তাবাদে চল বউ তুমাকে নেংটিবাবার কাছে ধন্না দিঁয়াই নিয়ে আসি গা। কিন্তুক বাবা, কলিকালের বউ, শাউড়ির কথা কি আর শুনে!—বলছে, তুমার পায়ে পড়ি ঠাকরুণ আমার আর ছেলে-পিলে চাই না। ইদিকে লখাই আমার বলছে, তুঁই চাই না বললে কি হবেক শালী, আমার চাই। এই নিয়ে তুজনাতে দিনরাত খিটির-মিটির গণ্ডুগুল বাবা, আমি আর লারছি হরি—

এই বলিয়া মাতুপিসি আবার চলিতে আরম্ভ করিল। হরিপণ্ডিতের কিন্তু এ-সব বাজে কথায় মন দিবার এখন আর অবসর ছিল না, রাণীর বিবাহটি কেমন করিয়া সুসম্পন্ন হইবে তাই সে মনে-মনে চিন্তা করিতেছিল; বলিল, গুটেক লোক-

জানাজানি গোলমাল করে কিছু কাজ নাই পিসি,—না, কি বল ? ডাক্তার আসবেক, আর আমি ত রইছি পুরুত, আর এদিককার সব ত ঠিকঠাক হঁয়েই রইল, তা বাদে, লে ঝপ করে, বোস পিঁড়েয়, আর দে সেরে।

মাতুপিসি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। একবার হাসিয়া গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া বলিল, সিদিকে তুর এই পিসিকে আর-কিছু শিকেতে হবেক নাই বাবা! বিয়ে কি আর ই-গাঁয়ে দিব রে মাণিক। বিয়ে হবেক হোই বোজনাথপুরে, রাণীর মামার ঘরে। নিতাইকে নিয়ে তুঁই যাবি সেইদিন রেতে, আখুনও ইকথা আমার লখাইও জানে না, রাণীও জানে না। বৌ-বেটা রইবেক ঘরে, আর রাণীকে বলব, চল মা, তুর মামীকে দেখে আসি-গা, চল, বলে বাস!

তবে আর কি পিসি, আট-ঘাট ত বাঁধাই রইল। বলিয়া গলি পার হইয়া হরিপণ্ডিত আবার সেই রোগীর ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পাঁজি আনিবার জন্য মাতুপিসি সেই ভাঙা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

লক্ষীনারাণের শয়ন-কক্ষের দরজায় তখন পুনরায় খিল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিত দেখিল, মুমূর্ষু রোগীর শিয়রের পাশে একাকী একটা চৌকির উপর বসিয়া বসিয়া নিতাই ডাক্তার তখনও ঝিমাইতেছে।

হরিপণ্ডিত তাহার আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তথাপি না হাসিয়া সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, কুথা গেল লক্ষীনারাণ ?

শুতে গেল উঘরে। বলিয়া ডাক্তার চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল, হরিপণ্ডিত হাসিতে হাসিতে তাহার হাতে ধরিয়া পুনরায় বসাইয়া দিয়া রোগীর মুখের পানে একবার ফিরিয়া

তাকাইয়া দেখিল, কোনও কথাবার্ত্তা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার আছে কি না।

ডাক্তারের দাড়ির ফাঁকে মুচকি-হাসির আভাস অনেকক্ষণ হইতেই পাওয়া যাইতেছিল, এইবার ভাল করিয়া হাসিয়াই বলিল, বল পণ্ডিত, উ আর দেখতে হবেক নাই।

পণ্ডিত তাহার পিঠের উপর ধীরে ধীরে বারকতক চাপড়াইয়া চুপি চুপি কহিল, হাজার ডুবে-ডুবে জল খাও, হরিশর্ম্মা স্বয়ং একাদশী,তড়াক ধরে ফেলবেক। ই একটো দাঁও রে ভায়া—

পাঁজি হাতে লইয়া মাতুপিসি ঘরে ঢুকিতেই হঠাৎ তাহার সহাস্য মুখ নিমেষেই আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। পাঁজিটি নামাইয়া দিয়া মাতুপিসি সরিয়া গেল।

তাহেলে দেখা যাক ইবারে। বলিয়া তেলের প্রদীপের কাছে সরিয়া গিয়া হরিপণ্ডিত দিন দেখিবার জন্য একান্ত মনোনিবেশ সহকারে পাঁজিখানি উল্টাইতে লাগিল।

দুজনে মিলিয়া অনেক দেখাদেখির পর দিন স্থির পর্যন্ত হইয়া গেল। আগামী বারো তারিখটা বিবাহের পক্ষে বেশ ভাল দিন, মাঝে আর মাত্র দুইটি দিন বাকি। ডাক্তার বলিল, হঁ, যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। মানে কথা ই সব কাজ—

হরিপণ্ডিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাহলে উঠা যাক ইবারে, না কি বল হে ডাক্তার! সবই ত ঠিক।

হঁ, আর-কি। বলিয়া ডাক্তারও উঠিল।

মাতুপিসি আলো দেখাইয়া তাহাদের বাহিরে লইয়া চলিল। হরিপণ্ডিত বলিল, বারোঁই। বুঝলে? তুমরা কালকেই চলে যাও পিসি, আমরা যাব সেইদিন রেতে।

চত্বরে পৌঁছিয়া হরিপণ্ডিত বলিল, যাও তুমি পিসি, আলোর আর দরকার নাই। দিব্যি জোস্তা।

পিসি সেইখানে দাঁড়াইয়া বলিল, তাহলে শিবভাবনায় থাকলম বাবা।

ডাক্তার একবার মুখ ফিরাইয়া বোধকরি সাহস দিতেই যাইতেছিল, কিন্তু হরিপণ্ডিত চতুর লোক, তাহাকে কোনও কথা বলিতে না দিয়া নিজেই বলিয়া উঠিল, শিবভয়ে পিসি, শিবভয়ে—খাতিরজমা থাক-গা যাও।

পাশেই ভিকুকত্তার ঘর হইতে ফেঁচ করিয়া একটা হাঁচির শব্দ পাওয়া গেল, ঠাণ্ডা লাগিয়া বুড়ার বোধকরি সর্দি হইয়া থাকিবে। কিন্তু হরিপণ্ডিত তাহা সহ্য করিতে পারিল না; বলিল, এই শুভকর্মে হাঁচি কেনে বাবা তুমার? ধীরে-ধীরে তুমি ইবারে এস গা যাও।

দেখিস বাবা! বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহারা আবার সেই বাহিরে আসিবার অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করিল।

অন্ধকারে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে চলিতে ডাক্তার বলিল, দেখ ভাই পণ্ডিত, বিয়ের এগুতে, কেউ যেমন—

আরে রামো বল! বলিয়া পণ্ডিত একবার অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল।

ডাক্তার-গিন্নির নাম বড় একটা কেহ জানে না, পাড়ার লোকে সচরাচর তাহাকে লক্ষী বৌ বলিয়া ডাকে। তাহার এই নামকরণের ইতিহাস সঠিক জানি না, তবে প্রকৃতি তাহার অত্যন্ত নিরীহ এবং শান্তশিষ্ট, কোমর বাঁধিয়া ঝগড়াঝাঁটি করিতে পারে না, এবং মুখের উপর কেহ যদি তাহাকে খারাপ কথা শুনাইয়াও যায়, বুঝিতে তাহার একটুখানি সময় লাগে, পাড়াগাঁয়ে এই দুর্মূল্য খেতাব-প্রাপ্তির হয়ত ইহাও একটা কারণ হইতে পারে।

বয়স তাহার চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। উপর্যুপরি তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর তুইটি পুত্র এখন তাহার বাঁচিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে, এবং আর-একটি নব-অতিথির শুভাগমন-উৎসব সম্প্রতি আসন্নপ্রায়। এই কম বয়সে এতগুলি সন্তান-লাভের পুণ্যের জোরেই বোধকরি তাহার এই মর জগতের নশ্বর দেহখানি দিন দিন অত্যন্ত ক্ষীণ তুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু ভরসার কথা এই যে, গত কয়েক মাস ধরিয়া সে ভাবিতেছে, স্বামীর রোজগার আজকাল একটুখানি বেশি, হয়ত বা এইবার তাহার সে হাড়কয়খানা ঢাকা পড়িতেও পারে।

যাহাই হউক, রাত্রি তখন কত হইয়াছে ঠিক অনুমান করা শক্ত, ডাক্তার আসিয়া তাহার দরজার উপর ধাক্কা মারিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রির এই শেষ প্রহরে বাহিরের সদর দরজায় ধাক্কা মারিয়া লক্ষী বৌএর ঘুম ভাঙান কঠিন। সমস্তদিন ঘরের কাজকর্ম, ছেলেদের ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট সামলাইয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্যান্ত স্বামীর জন্য জাগিয়া থাকিবার পর—আসন্ন প্রসবা সে মেয়েটি তখন বাহিরের সর্বপ্রকার সাড়াশব্দে উদাসীন হইয়া সত্য-সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু নিতাই ডাক্তার সেকথা বুঝিল না, কণ্ঠস্বর তাহার ক্রমশঃ অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠিতে লাগিল। চাষাদের যে মেয়েটা ঘরে শুইয়া থাকে, সেটাও কি মরিল নাকি ?

ডাক্তারের হাঁক ডাকে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ছেলেটার বয়স চার পাঁচ বছরের বেশি নয়, অন্ধকার ঘরে এই সদ্যজাগ্রত ছেলেটা প্রথমে কিছুই ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না, অবশেষে ভয় পাইয়া সে তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পাশে আর একটা কাঁচ ছেলে তখন ঘুমের ঘোরেই মাই টানিতেছিল, সেটাও কাঁদিতে লাগিল। তুইদিক হইতে তুইটা ছেলের কান্নায় লক্ষী বৌএর ঘুম ভাঙিতে দেরি হইল না।

কিন্তু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতে গিয়া দেখিল, লম্ফটি চৌকাঠের উপর জ্বালিয়া রাখিয়া চাষাদের বুঁচির মা তাহার পূর্বেই শয্যা-ত্যাগ করিয়া খিল খুলিবার জন্য উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই সে আবার চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। ঘরে আলো দেখিয়া ছেলে দুইটা তখন চুপ করিয়াছিল।

বাহিরে আলোকের কোনও প্রয়োজন ছিল না, অপর্যাপ্ত জ্যোৎস্নায় সমস্ত উঠানটা ভরিয়া গিয়াছে। সদর দরজাটা পার হইয়া আসিয়াই ডাক্তার দেখিল, বুঁচির মা খিল খুলিয়া দিয়া দুয়ারের এক-পাশে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার বলিল, বড়ো রাত হঁয়ে গেল।

বুঁচির মা বলিল, আমরাও তাই ভাবছিলম বাছা।

তবে তুমি যাও ইবারে, ঘরকে যাও—

পাশেই তাহার ঘর। নিজের 'রস-পিত্তির' ব্যারাম আছে, ঘন-ঘন জ্বর হয়, ডাক্তারকে হামেশাই তাহার প্রয়োজন, কাজেই ডাক্তারের দরকার হইলে এটা ওটা সেটা তাহাকে করিয়া দিতে হয়। ডাক্তার কোথাও কোনও কাজে বাহির হইয়া গেলে তাহার বাড়িতে আসিয়া রাত্রে সে শুইয়া থাকে, পুকুর হইতে দু এক কলসি জল আনিয়া দেয়, ছোট ছেলেটা কান্নাকাটি করিলে কোলে লইয়া তাহাকে খানিকটা ঘুরাইয়া আনে! এমনি করিয়াই তাহার বিনাপয়সার বেগার চলে।

বুঁচির মা বলিল, তাহেলে আমি যাই বাবা।

হঁ যাও।

তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া দরজাটা ডাক্তার সশব্দে বন্ধ করিয়া ফেলিল; খিলটা দুই হাতের মুঠায় বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া একবার ঝুলিয়া দেখিল, সেটা ঠিক নিরাপদ হইয়াছে কি না, তাহার পর সরাসর ঘরে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মী বৌএর বিছানার দিকে একবার তাকাইল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না।

সেদিন ভিজিটের দরুন ডাক্তারের নগদ পাওনা হইয়াছিল পাঁচসিকা। চৌকাঠের উপর হইতে লম্ফটি তুলিয়া লইয়া ডাক্তার পাশের একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল, খেরুয়া-বাঁধা একটি খাতায় প্রথমে সে তাহার জমার হিসাবটা ঠিক করিয়া লইল, তাহার পর কাঠের ছোট ক্যাশ বাক্সটি খুলিয়া পকেট হইতে পয়সাগুলি গুনিয়া তাহাতে রাখিতে যাইবে, এমন সময় লক্ষী বৌ তাহার বিছানা হইতে বাহিরে মাথাটা একটুখানি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ যে এত দেরি হল, হ্যাঁগা ?

লক্ষী বৌএর বাপের বাড়ি কাটোয়া অঞ্চলে, কাজেই তাহার কথায় বার্তায় শ্বশুরালয়ের সাঁওতালি স্থর এখনও বেশ আয়ত্ত হইয়া ওঠে নাই।

ডাক্তার প্রথমে তাহার কথাটার উত্তর দিল না, ধীরে ধীরে ক্যাশ বাক্সটি বন্ধ করিয়া বলিল, জানে না যেমন ! লেকা ! কেন ? ফিষ্টির চাল দিঁয়েছিলে, সেইখানেই ছিলম এতক্ষুণ।

কিন্তু লক্ষী বৌএর এই সামান্য একটা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। টাকাটা সে ঠিক বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিল বলিয়া তাহার স্মরণ হইল না। জামার সমস্ত পকেটগুলা সে আর একবার বৃথাই অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কিছু না পাইয়া আবার সে বাক্স খুলিয়া তহবিল মিলাইতে বসিল।

এই দুই স্বামী স্ত্রীর বিশেষত্ব এই যে, স্বামী যেমন দিবারাত্রি কথা বলিতে ভালবাসে, স্ত্রী কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। কথা সে খুব কমই বলে, কিন্তু আজ দিনের বেলা একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। একটাকার একখানি নোট ডাক্তার আজ মনের ভুলে তাহার খাটের নীচে ফেলিয়া গিয়াছিল, বৈকালে ঝাঁট দিতে গিয়া লক্ষী বৌ সেটি কুড়াইয়া

পাইয়াছে। এরূপ ঘটনা এ-বাড়িতে কোনদিনই প্রায় ঘটে না, তাই এই লইয়া স্বামীর সহিত একটুখানি রহস্য করিবার জন্য আজ আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে কহিল, কি গো, আজকাল যে তোমার মেলা টাকা।

ঘরের ভিতরে ডাক্তার তখন সবেমাত্র মাতুপিসির দেওয়া পাঁচকুড়ির প্রথম কুড়িতে হাত দিয়াছিল। লক্ষী বৌএর এই টাকার ইঙ্গিতটা তাহার কাণে গিয়া কেমন যেন খট করিয়া বিঁধিল তাহার আর টাকা গোনা হইল না। সেদিনের মত তহবিল মিলান স্থগিত রাখিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে বলিল, হুঃ! টাকা রইছে! কুথা পাবে টাকা! এই বলিয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া আসিল।

লক্ষী বৌ বুঝিল যে টাকা হারানোর ব্যাপারটা সে বুঝিতে পারে নাই। আজ রাত্রে সেকথা তাহার আর বুঝিয়াও কাজ নাই ভাবিয়া সে চুপ করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

মুখে হাসি দেখিয়া ডাক্তারের সন্দেহ যেন আরও একটুখানি বাড়িয়া গেল। জামা খুলিয়া সে তাহার খাটের উপর আসিয়া বসিল। বলিল, বড়ো যে তারবেলাতেই হাঁসি হছে ফিকফিকেঁই। টাকা তুঁই আমার কবে দেখলি? টাকা?

কিন্তু পয়সা নয়, আনি-দুআনি নয়, একটা টাকা হারাইয়াও স্বামী যে তাহার এখনও পর্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, এই ভাবিয়া লক্ষী বৌএর হাসি কিছুতেই থামিতেছিল না, মুখে কিছু না বলিয়া আবার সে হাসিতে লাগিল। কিন্তু সে হাসি ডাক্তারের অসহ্য হইয়া উঠিল। দাড়িওয়ালা মুখখানি বিকৃত করিয়া কহিল, এঁঃ! বাঃ! হাঁসি! আ, কি সাজছে উ-মুখে!

এইবার লক্ষী-বৌএর হাসি থামিল। বলিল, বা, নিজে ফেলে গেছ, আর দোষ হল আমার হাসির? বেশ, আর হাসব না কখনও।

ডাক্তার এইবার একটুখানি আশ্বস্ত হইয়া কহিল, তাই বলতে হয় এগুতে, না, শুধুই কইছে টাকা! মেলা টাকা! মানে-কথা, কি ফেলে গেইছি তাই বল কেনে?

লক্ষী বৌ বলিল, নোট একটি।

লোট!

ডাক্তার একটুখানি আশ্চর্য হইয়াই বলিয়া উঠিল, কত টাকার? এ্যাঁ!

সেই ছোট একখানি কাগজ, এক টাকার।

ডাক্তার বলিল, তাই হক। উ ত মানে কথা, আখুনি তহবিল মিলালেই ধরা পড়ে যেথো! মানে কথা, হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না। তা তুঁই লেগা যা উটো, তুখে উটো আমি দিলম। বলিয়া ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে বলিল, লে ঘুমো, কালকে ভোরে উঠেই আবার আমাকে ছুটতে হবেক!

লক্ষী বৌ জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবে?

ডাক্তার ঢাকাঢুকি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, বলিল, ডাকে, ডাকে! মানে কথা, কম সম লয়—হোউ, লবাবগঞ্জের ডাক।

গ্রাম হইতে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে ছোট একটি শহরের নাম নবাবগঞ্জ। সেখানে ডাক্তার কবিরাজের অভাব নাই। কত বড়-বড় চিকিৎসক সেখানে আছেন, তবুও যে সেখান হইতে তাহার স্বামীর 'ডাক' আসে এই আনন্দে লক্ষী বৌ কিয়ৎক্ষণ কথা বলিতে পারিল না, পরে কহিল, হ্যাঁগা, তোমাদের নবাবগঞ্জ খুব বড় জায়গা, নয়? আমাদের সেই পাঁচুইএর মতন? খুব বড় বড় ডাক্তার আছে, না?

কিন্তু নবাবগঞ্জ হইতে তাহার ডাক যে কোনদিন আসিতে পারে না, এই সামান্য কথাটাও যে লক্ষী বৌ বুঝিতে পারিল

না এবং তাহার মত ভ্যাবাকান্ত মেয়েকে ফাঁকি দেওয়া যে কত সহজ, ইহারই আনন্দে ডাক্তারের জাগরণ ক্লান্ত চোখের ঘুমও যেন ঈষৎ পাতলা হইয়া গেল। আপন মনেই বলিতে লাগিল, হুঁ! তুদের পাঁচুই ত পাঁচুই! অমন সাতটা বাজার একসঙ্গে জড় করলে তবে আমাদের লবাবগঞ্জ! ডাক্তার? হুঁ—তুদের সেই পাঁচুইয়ের বদি-ডাক্তার লয়, যে বলবেক, কে বেটে? কি হইছে রে বেটা তুর? আজ্ঞে প্যাটে বাজছে। কই? ইদিকে আয় বেটা, ইদিকে আয়, সরে আয়, সরে আয় বলেই তাখে পিথমে ডাকলেক কাছকে, তা বাদে বেশ করে লিজের ছামুতে ডাঁড় করাই রুগীর প্যাটে দিলেক ভিট করে একটো কিলেঁই। বাস! হয়ে গেল চিকিছ্যে! ই-বাবা তা লয়! মানে কথা, টাউন যাখে বলে, তবে আর বলেছে কেনে—টাউনের ডাক্তার!

এমনি সব আবোল তাবোল বকিতে বকিতে ডাক্তার এক-সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া নবাবগঞ্জ হইতে ফিরিতে ডাক্তারের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কাপড়ের একটা পুঁটুলিতে বাঁধা কয়েকটা জিনিষ অন্ধকারে লুকাইয়া ডাক্তার ঘরের ভিতর রাখিতে যাইতেছিল, লক্ষ্মী বৌ দেখিতে পাইয়া বলিল, কি ও?

আসতে মিলতেই অমনি লজর পড়েছে? দাঁড়া বলি, হাত-পা ধুই—দে জল টল দে এগুতে। বলিয়া ডাক্তার সেটা প্রথমে ঘরের ভিতর রাখিয়া আসিল।

হাত মুখ ধুইয়া ডাক্তার বলিল, উটো কি বেটে তাই শুদোছিলি? শুন তেবে। গেলম রুগী দেখতে, যেঁয়ে দেখি, না, বাস! মানে কথা, আমার এক ফোঁটা ওষুধেই রুগী চাঙ্গা! ওঃ! সে যদি দেখথিস লক্ষ্মী বৌ! যেতে না যেতেই, ওরে খাট

রে, ওরে জল রে, ওরে তামাক রে, মানে কথা, আদর-যত্ন খুব। তা-বাদে হল কি! আমি টুকছেন থামতে বাদেই উয়ারা বল্লেক—হুজুর, আপনাকে ত তাহেলে আর একবার পরশু যেতে হছে।

আমি বললাম, কুথা?

বল্লেক, সে হুজুর—এক রাজার ঘর। তার ছুটু ছেলেটিরও ঠিক এমনি অসুখ। আপনাকে যেতে হবেক।

আমি আবার বললাম, বিজিট লাগবেক এনেক, তার উপরে ঘোড়া আছে।

বল্লেক, ঘোড়াটো আর এনে কাজ নাই, আমরা হাওয়া-গাড়ীতে চাপাঁই নিয়ে যাব।

তা বলি অমন দাঁও আর ছাড়ি কেনে। বললম, বেশ তাই যাব, কিন্তুক একরেতের বেশি থাকতে লারব আমি, সে কথাটাও বলে দিলম। বল্লেক, তাই তা-ই। যা বললম তাথেই রাজি। তাবাদে, ভাবলম, কি, যে যাব ত হাওয়া-গাড়ীতে, কিন্তুক আমার এই ছেঁড়া ধূল্লোফুটো জুতো, জামা—তাথেই বলি ত, লে, যায় বাহান্ন তায় তিপ্পান্ন, মানে কথা নিয়ে এলম কিনে এক-সাজ লতুন বেশ সস্তা দেখে।

লক্ষ্মী বৌ এতক্ষণ হাঁ করিয়া তাহার স্বামীর এই সুখ-সৌভাগ্যের কথা শুনিতেছিল, পরে হাসিতে হাসিতে হাত নাড়িয়া বলিল, সেই কালো দেখে বেশ চকচকে একখানি জামা আনলে না কেন? তোমার সুন্দর গায়ে বেশ সাজত।

এনেছি, এনেছি। মানে কথা, দেখবি পরশু যখন পরব।

লক্ষ্মী বৌ হাসিতে হাসিতে আবার বলিল, আর ওই তোমার পাটার মত একমুখ দাড়ি কেটে ফেল বাপু তুমি—

পাঁঠার মতন? ধেৎ! কই নিয়ে আয় দেখি তুর আয়নাটো

—বলিয়া সে তাহার দাড়ির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, নাঃ! দাড়ি না রাখলে এই যে গাঁয়ের ছুটুলোক শালারা ভয় করে না। বিজিট টিজিট তাহলে কেউ দিবেক নাই।

বারোই তারিখ বৈকালে ডাক্তার তাহার নূতন সাজ পোশাক পরিয়া গ্রামের বহিঃপ্রান্ত দিয়া পদব্রজে চুপি চুপি তাহার রাজার বাড়ির ডাকে বাহির হইয়া গেল।

সাড়ে তিনক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া রেল স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিতেই দেখিল, পূর্বের পরামর্শমত টিকিট ঘরের সুমুখে হরি পণ্ডিত ঠিক চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাঙা একটা ছাতির মাথায় গামছা দিয়া একগোছা কুশও সে বাঁধিয়া আনিতে ভুলে নাই।

পরদিন বৈকালের দিকে ডাক্তার ও হরি পণ্ডিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার গ্রামে ঢুকিল এক পথে—হরি পণ্ডিত অন্যপথে।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই ডাক্তার শুভসংবাদ পাইল। শুনিল, গতরাত্রে স্ত্রী তাহার একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে বুঁচির মা সেই দিকেই আসিতেছিল, ডাক্তারের কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না, আনন্দে সে নিজেই বলিতে লাগিল, পইপুয়াতি ভালই আছে বাছা। এস, দেখসে এস, তুমার চাঁদ-পারা বেটা। বেটার মুখ দেখেই ঘর ঢুকবে, এস বাবা এস। বলিতে বলিতে সুমুখে আঁতুরঘরের দিকে সে তাহার আগে আগে চলিতে লাগিল।

রান্নাঘরের পাশে অন্ধকার এবং অপরিসর নোংরা যে-ঘরখানির মধ্যে ডাক্তারের বাছুর ও ছাগলগুলি বাঁধা থাকিত, আজ তাহাই হঠাৎ আঁতুর-ঘর হইয়া উঠিয়াছে। দরজার কাছে চার কোণা একটা মাটির গর্তের ভিতর রান্নাঘরের ফেন পচিয়া

অত্যন্ত দুর্গন্ধ উঠিতেছিল, আর-একদিকে গোয়ালের গোবর ও আখার ছাই ফেলিবার জায়গা, তাহার উপর কয়েকটা বুনো-কচুর গাছ জন্মিয়াছে।

ঘরের ভিতর কাঠের ধুনি জ্বালান হইয়াছিল, কিন্তু কাঁচা-কাঠের ধোঁয়ায় ঘরটা এমনি 'গর্দ্দগোল' হইয়াছে যে, ভিতরের কোনও বস্তুই বাহির হইতে ডাক্তারের নজরে পড়িল না, সদ্যজাত শিশুর সুতীক্ষ্ণ ক্রন্দন এবং চোখে মুখে ধোঁয়া লাগিয়া প্রসূতির কাশির শব্দ ছাড়া সে আর কিছু শুনিতেও পাইল না।

দরজা হইতে বুঁচির মা ডাকিল, দাই, ও দাই, ছেলের বাপ এসেছে, ছেলে দেখাও।

সহসা ধোঁয়া ভেদ করিয়া চৌকাঠের পাশে বাউরি-বুড়ীর মুখখানি বাহির হইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে বলিল, কই, কি দিছ দাও আমাকে এগুতে, তেবে দেখাব। ষুলো-আনার কম ছাড়ব নাই, তা বলে দিছি কিন্তুক।

এমন সময় 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাক্তারের আড়াই-বছরের ছোট ছেলে চ্যাপ্‌টা, সেই ধোঁয়ার ভিতর হইতে চোখ বুজিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

থাম, থাম শুয়ার থাম। বলিয়া ডাক্তার তাহাকে চুপ করাইয়া দিয়া সেইখান হইতেই, ফিরিল।

বুঁচির মা ছেলেটাকে কোলে লইয়া বলিল, কই, দেখলে নাই যে বাবা?

দেখব ইয়ার পর, যে ধুমো।

ডাক্তার ঘরে গিয়া উঠিল।

কিন্তু ঘরেও সে একাকী বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না! নূতন সাজ-পোষাক ছাড়িয়া আবার সে তাহার চিরপুরাতন জামা জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

বোজনাথপুরের ব্যাপারটা সেদিন তখনও এ-গ্রামে আসিয়া পৌঁছে নাই। কিন্তু এ-সংবাদ গোপন থাকিবার নয়। পরদিন দুপুরে রাণীকে লইয়া মাতুপিসি বোজনাথপুর হইতে ফিরিয়া আসিল এবং সেই দিনই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে সমস্ত গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, রাণীর নাকি হঠাৎ বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদেরই গ্রামের নিতাই ডাক্তার টাকার লোভে পড়িয়া ভিন্ন গ্রামে লুকাইয়া গিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে সেদিন শুধু ইহারই আলোচনা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যায় ভৈরবতলায় সেদিনও রীতিমত বৈঠক বসিয়াছিল। কান্ত সম্প্রতি তাহার ফুটা ডুগি-তবলাটা চামড়া দিয়া 'ছাদন' করাইয়া আনিয়াছে, তাই লইয়া ভুতো, নন্দা প্রভৃতি গ্রাম্য যুবক-গণের পুরাদস্তুর গীতবাদ্যের চর্চা চলিতেছিল, এমন সময় মাখনা কোথায় শুনিয়া আসিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের কাছে এই মজার সংবাদটি পৌঁছাইয়া দিল।

অত্যন্ত দ্রুতবেগে হাত ও মাথা নাড়িয়া কান্ত তখন জলদ-কাওয়ালি বাজাইতেছিল, বাজনার শব্দে কথাটা সে প্রথমে শুনিতে পায় নাই, পরে রাণীর নামটা তাহার কানে পৌঁছিতেই বাজনা এবং ঘাড় দুই-ই এক সঙ্গে থামিয়া গেল, বলিল, কি, কি, কি বেটে, রাণী কুথা ?

নন্দলাল হাসিতে হাসিতে ব্যাপারটা তাহাকে বুঝাইয়া দিল।

পঞ্চু বলিল, ওরে বাবা, লিমুসকে ডান !

প্রবাদ বাক্যটা নন্দ পূরণ করিয়া দিল।

বলিল, ছেলে খাবার আঁদি।

কান্তর মুখ দিয়া কোনও মন্তব্যই বাহির হইল না; অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, মাখনা, তুঁই একবার ডাক ত পণ্ডিতকে।

কালী-ঘরের কোণ হইতে কে-একজন বলিয়া উঠিল, হঁ, হঁ, এই বেলা জিবনের সঙ্গে লাগাও উয়াকেও—

পণ্ডিত একা আসিল না, ডাক্তারও তাহার ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল; কিয়ৎক্ষণ পরে দুজনে একসঙ্গে আসিয়াই কালী-ঘরে আবির্ভূত হইল।

কান্তর মুখ দিয়া এতক্ষণে কথা বাহির হইল। বলিল, কি হে ডাক্তার। ই যে মেঘে-মেঘে বেলা এনেক!

আর বেলা এনেক! মুখ বুঁজে গু-খাওয়া হঁইছে রে ভাই, মানে কথা, বলিয়া ডাক্তার চাটাই-এর এক পাশে গিয়া চুপ করিয়া বসিল।

পণ্ডিত মুখ বুজিয়া পূর্বাহ্নেই উপবেশন করিয়াছিল, বলিল, থাম, থাম, এগুতে ইয়ার পিতিকার হক, তাবাদে হবেক সব।

পঞ্চু বলিয়া উঠিল, হঁ হঁ, ডাক্তার বহুৎ রোজগার করেছে, পলোয়া হঁয়ে যাক আজকেই।

পঞ্চুর দিকে মুখ ফিরাইয়া পণ্ডিত বলিল, থাম, পলোয়া খাবেক! এঃ।

পণ্ডিতের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া সকলেই কিঞ্চিদধিক আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিল।

পণ্ডিত আর ভাঙিয়া-ফুটিয়া কোনও কথা বলিল না, ডাক্তারকে একবার ইশারা করিয়া চুপি চুপি বলিল, তাহলে আসি একবার আমি ঘুরে, দেখি, শ্যাষ-কথা কি বলে।

ডাক্তার বলিল, আমিও যাব নাকি তুমার সঙ্গে?

না, না, তুমি যাবে কি হে! অমনি শুদু-শুদুই! তাহেলে ত

শালী মাথায় উঠবেক। বলিতে বলিতে পণ্ডিত একটা লণ্ঠন তুলিয়া লইয়া কালী-ঘরের নীচে তাহার চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া মাতুপিসির ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সমবেত ছোকরাগুলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছিল; বুঝিতেছিল, ভিতরে ভিতরে ব্যাপার একটা কিছু হইয়াছেই। কিন্তু পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহাদের হইল না, সে চলিয়া গেলে ডাক্তারকে সকলে মিলিয়া ধরিয়া বসিল, কি বেটে, কি হঁইছে, কি বল কেনে, কি হঁইছে কি হে!

ডাক্তার একবার তাহার দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল, মানে, ওই যে বললম, হঁয়ে গেইছে—আর কি বলব?

কান্ত বলিল, আরও কিছু হওয়া বেটে, পণ্ডিত কুথা গেল?

ডাক্তার বলিল, গেল ওই উয়াদেরই ঘরকে।

কেনে?

কথাটা বলিতে ডাক্তার প্রথমে একটুখানি ইতঃস্তত করিতেছিল, কিন্তু জোর করিয়া ধরিয়া বসিলে বলে না, ডাক্তারের কাছে এমন কোনও কাজ এখনও জগতে সৃষ্টি হয় নাই। বলিল, আর বলছ ভাই, হঠক্কারে করে ফেললম এই গুখোরি কাজটো।

কিন্তু রাণীকে বিবাহ করিয়া মানুষের এত অনুতাপ যে কখনও হইতে পারে, কান্ত তাহা বিশ্বাস করে না, বলিল, গুখোরি আবার কি রকম, গুখোরি কি হে? মরদ বেটা ছেলে, বেশ করেছ। লাও ইবার একটো ফিষ্টি লাগাই দাও এইখানে।

ডাক্তার বলিল, ফিষ্টি ত ফিষ্টি, ভেবেছিলম পলোয়া-লুচি আচ্ছা করে দিব খাঁওয়াঁই, কিন্তক মানে কথা, ইদিককার একটো বড়ো গোলমাল হঁয়ে গেইছে। মানে কথা, বিয়েটোই করছি, মানে কথা, পয়সাকড়ি যা দিব বলেছিল একপয়সাও দিলেক নাই মাগী।

নন্দলাল বলিয়া উঠিল, নাই বা দিলেক, নাই বা দিলেক—পয়সাতে মেয়েতে বহুৎ তফাৎ।

পঞ্চু বলিল, মাতি শালী চিরকালের কিপ্পিন, উ দিবেক পয়সা!

কথাটা ডাক্তারের বুকে বড় জোর বাধিল। বলিল, দিবেক নাই? মানে কথা, বিটি ত দিয়েছে! আমিও বাবা ডাক্তারি করে খাই, মানে কথা, কথায় রইছে—সহস্তমারি চিকিচ্ছকঃ! একটি ফোঁটা, বেশি লয়, এক ফোঁটা 'গিজেটেলিস্' খাঁওয়াঁই দিলেই সাবাড়! মানে কথা, বেশি কিছু বাড়াবাড়ি করে ত তখন বৌ ঘরে এনে, বাস! কলেরা হঁয়েছিল!

কান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহুঁক! না, না, তা লয়, তা লয়, উ-সব করা ঠিক লয়। কুলিনের ছেলে বিয়ে করলে, লিলে নাই, বাস, দিবে ছেড়ে—তাবাদে ঘুঁটে কুড়োকগো যাক, যা-খুশি করুকগো—তুমার অত-সব দেখে কাজ নাই।

নন্দলাল বলিল, তা বৈকি!

পঞ্চু বলিল, চরে খাকগো।

এমন সময় লণ্ঠন হাতে বকুলতলায় পণ্ডিতকে আসিতে দেখা গেল। সে বেশ জোরে জোরেই বলিতে বলিতে আসিতেছিল, আচ্ছা দেখা যাক তেবে, ইয়ার পিতিবিধান কিছু করতে পারি কি না, কুলিনের ছেলে, বিয়ে দিয়ে শেষকালে কান মলে তেড়ে দেয়া! বটে, বটে, কলির ধম্মই যে তাই! আচ্ছা, আচ্ছা—

হরি পণ্ডিত ভৈরবতলার উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই কান্ত, নন্দলাল প্রভৃতি সকলে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, কি হল? কি হল পণ্ডিত?

রাগে পণ্ডিতের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, হাতের ইশারায় সেইখান হইতেই ডাক্তারকে ডাকিয়া বলিল, শুন!

ডাক্তার তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া হোঁচট খাইয়া পণ্ডিতের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

পণ্ডিত তাহাকে উঠানের ঘেঁটু-ঝোপের একটুখানি আড়ালে লইয়া গিয়া লণ্ঠনটা মাটিতে নামাইয়া বসিয়া পড়িল, বলিল, বস এইখানে, এনেক কথা।

ডাক্তার সেইখানেই উবু হইয়া বসিলে পণ্ডিত বলিল, শালীর কে কান ভাঙানি দিয়েছে ঠিক। বলে কিনা পাঁচ কুড়ি টাকা নগদ দিঁয়েছি, আবার কি দিব উ দোজবেরে জামাইকে? তেবে হঁ, ষুলোআনার ছামুতে যদি বলে যে, হঁ, আমার রাণীকে নিয়ে ঘর করবেক, ভাত-কাপড় দিবেক, তাহেলে আরও কিছু দিতে পারি।

ডাক্তার বলিল, আরও কিছু মানে? আরও পাঁচশ টাকা দিবার কথা যে?

হরি পণ্ডিত বলিল, কাজ ফুরেঁাই গেইছে আবার কি? লায়ে পেরেঁই লাউড়ে শালা! আমি তখনই বললম যে তুমাকে ডাক্তর, বলি, লাও এগুতে লগদ টাকাটি গুনে লাও, তাবাদে মাথায় সিঁদুর দদাড়ো। তা না, তুমি তখন ওই মেয়েটাকে দেখেই অস্থির, খপ করে বলতে না বলতেই দিলে সেরে—

ডাক্তার একটুখানি লজ্জিত হইয়া বলিল, বলেছিলে বটে! কিন্তুক না হে পণ্ডিত, তা লয়, আমি ভাবলম কি, মানে কথা, বিটিটোকে যখন দিছে তখন টাকা কি আর না দিবেক শালী! তাথেই বলি গুটেক লোক জানাজানি হবার এগুতে দে সেরে— মানে কথা—

ডাক্তার আরও কি বলিতে যাইতেছিল, পণ্ডিত গলাটা তাহার আরও একটুখানি খাটো করিয়া বলিল, না ডাক্তর, মাগীর ত্যাল হঁইছে! আমার সেই বাবা ভৈরবের ড্যাড় বিঘে

জমি বলেছিল—দিব। আজকে উ-কথাও বললম, তাথে বলে কি শুনবে? বললেক, তুঁই কে রে আমড়া-দাট্যা ছোঁড়া!

পণ্ডিতের মুখ দিয়া রাগে অভিমানে আর কথা বাহির হইতেছিল না। ডাক্তারও চুপ করিয়া রহিল।

অবশেষে হরি পণ্ডিত বলিল, না ভাই, আমার ত মনে হয় —যা বুঝি আমি···

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, কি?

কি? কি আবার! ইসব কাজের শেষ-ঢ্যাশ করে দেওয়াই ভাল। একেবারে খতম।

ডাক্তার বলিল, টাকা না পেলে আমি আর উ মেয়েকে লিছি নাই, সে তুমি দেখে লিও পণ্ডিত। মানে কথা, নিতাই ডাক্তারের পায়ার জোর আছে, নৈকুষ্যি কুলিন, বিষ্টুঠাকুরের সন্তান! বার কর ই-মুলুকে কুথাম—দেখি কেমন মরদ!

পণ্ডিত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তাথেই ত বলছি, দাও চুকোঁই, জ্বালা-কালা দাও শেষ করে—মাগীর ছুঁচো-মুখ বুঁচো হঁয়ে যাক!

ডাক্তার বলিল, হঁ ত কি বেটে!

হরি পণ্ডিত বলিল, তবে লাও, ডাকাও কাল সকালে এইখানে ষোল-আনার বামুন, ভট্‌চায আনাও, নিয়ে, হঁয়ে যাক 'কুশ-পঁথোল। বলা যাবেক—মেয়েটা দুষী বটে!

পণ্ডিত যে কুশ-পুত্তলিকা করিয়া রাণীকে চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিবার কথা বলিতেছে ডাক্তার প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। বলিল, টাকা উ-মাগী কিছুতেই দিবেক নাই—লয়? তবে মানে কথা, একবারে হঠক্কারে ই-কাজটো না করে দু-একদিন দেখলে হয় না?

পণ্ডিত বলিল, তুমি দেখ। আমার আর দেখবার কিছু নাই

ভাই, আমি উঠলম। বলিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিল, ডাক্তার খপ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, বস, শুন, মানে কথা, তাহেলে তাই হক, কাল ডাকাও ষোল-আনার বামুন!

পণ্ডিত এইবার জোরে জোরেই বলিয়া উঠিল, ইয়েতে ষোল-আনা তুমার কি করবেক হে? তুমি কুলীনের ছেলে, বিয়ে করেছ, টাকা তুমার হক্কের পাওনা। না দেয়, মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে পার, কুশ-পথোল করতে পার, তুমার যা খুশী তাই তুমি কর কেন্নে হে ঠাকুর!

ডাক্তার বলিল, তবে তাই হক, ওই কুশ-পথোল না কি বলছ, তবে তাই হক! টাকা দিব বলেছিলি, দিঁয়েছিলম সিঁতুর দদাড়ে তুর বিটির কপালে, টাকা দিলি নাই, মানে কথা, বাস—কুনু সম্মন্দ নাই তুর সঙ্গে আমার!

এই বলিয়া মনের দুঃখে ডাক্তার তাহার নবপরিণীতা বধূর উদ্দেশে একটা বড় অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া ফেলিল।

পণ্ডিত বলিল, হুঁ সেই ভাল।

ডাক্তার বলিল, তবে তাই হক।

সে-রাত্রের মত কথাবার্তা এই পর্যন্তই হইয়া রহিল।

ডাক্তার যখন বাড়ী ফিরিল, রাত্রি তখন প্রায় নয়টা বাজিয়াছে।

পাড়ার একটি বামুনের মেয়ে রান্না করিয়া দিয়া ভাত চাপা রাখিয়া বাড়ী গিয়াছিল। বুঁচির মা বলিল, আজকার মতন লিজেই বেড়ে খাও বাবা, রান্নাঘরে ভাত তোমার চাপা দিয়া আছে।

ডাক্তার সরাসর রান্নাঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, ধাই-এর

কাছে নবজাত শিশু সন্তানটিকে ফেলিয়া দিয়া লক্ষ্মী বৌ একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রসূতিকে আঁতুর-ঘর হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়া বুঁচির মা বলিয়া উঠিল, ওমা! তুমি আবার বেরেলে কেনে বৌ?

কিন্তু অশুচি এই মেয়েটি কাহারও কোন কথা শুনিল না। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গিয়া নিতান্ত সঙ্কোচে ডাক্তারের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাগা, কি যেন শুনলাম, ওই যে গৌরী বলে গেল, সত্যি?

ডাক্তার বলিল, ধেৎ, ধেৎ! উ কিছু লয়, কুশ-পঁথোল হয়ে যাবেক কালকেই।

কিন্তু এই 'কুশ-পথোলে'র অর্থ সে জানিত না। জানিবার প্রয়োজনও কোনদিন হয় নাই। স্বামীর মুখের পানে আর-একবার বড় করুণ দৃষ্টিতে সে চাহিল; মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইতেছিল না, একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, তাহলে সত্যি? বলিতে বলিতে ঠোঁট দুইটা তাহার কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আঁতুর-ঘরে খড়ের বিছানার উপর শুইয়া লক্ষ্মী বৌ কাঁদিতেছিল। দাই-মা বারকয়েক তাহাকে নিষেধ করিল, কিন্তু বারণ যখন সে কিছুতেই শুনিল না তখন তাহারও অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রসারিত দুই পায়ের ফাঁকে কচি ছেলেটাকে শোয়াইয়া সে তেল মাখাইতেছিল, বলিল, ওগো, কেঁদ না ত তুমি! তুমার এমন সোনার চাঁদ ছেলে হঁয়েছে, বিয়া করুকগা কেনে উ।

লক্ষ্মী বৌ উপুড় হইয়া শুইয়া শুইয়া ফুলিতে লাগিল।

দাই-মা আবার বলিল, আঁতুরের পুয়াতিকে কাঁদতে নাই বৌ, কেঁদ না।

কিয়ৎক্ষণ পরে কান্না থামাইয়া লক্ষী বৌ উঠিয়া বসিল।

দাই-মা আপন মনেই বলিতে লাগিল, অঁ, ভারি ত বিয়া! অমন কত হছে। আশিন মাসে সেই শুনলে নাই, লখি ডোমের মরদ হোই উ পাড়ার বসনিকে নিয়ে গেল পলাঁই। মাগ ছেলে রইল পড়ে, কুথা যে গেল দুজনাতে, তার কুন্থু তলা মামলাই নাই। অমন করে গ, মরদগলা অমনি বেটে।

বামুনদের যে বিধবা মেয়েটি আজ কয়েকদিন ধরিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে রান্না করিতেছিল, হাসিতে হাসিতে সে আঁতুরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

দাই-মা বলিল, অই দেখ মা! বলিয়াই সে আঙুল বাড়াইয়া লক্ষী বৌকে দেখাইয়া দিল।

বামুন-মেয়ে দোক্তা চিবাইতেছিল, হঠাৎ কথা বলিতে পারিল না; দরজার পাশে খানিকটা থুতু ফেলিয়া বলিল, ইদিকে ত দেখে এলাম ভৈরবতলায় লাগ ভেলকি, লেগে গেইছে মজা।

পাশেই রান্নাঘরের ভিতর বসিয়া বুঁচির মা উনান ধরাইতেছিল, বামুন-মেয়ের লাগ ভেলকির কথা শুনিয়া ছুটিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

বামুন-মেয়ে হাসিতে হাসিতে কহিল, পণ্ডিত রঁইছে, ডাক্তার রঁইছে, নন্দ, ভুতু, কান্ত, আরও এক গাদা লোক রঁইছে দেখলম, কান্ত কি বলছে শুনবে? বলিয়া সে আর একবার থুতু ফেলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া আর এক দফা হাসিয়া লইল।

বুঁচির মা বলিল, কি বলছে?

বামুন-মেয়ে কহিল, বলছে শালীর নাক কাটব।

কথাটা শুনিয়া বুঁচির মা হাসিল; দাই-মা বলিল, উয়ার নাক কেটে কি হবেক মা?

লক্ষী বৌ হাসিতেও পারিল না, কথাও বলিল না, পাশ

ফিরিয়া বিষণ্ণ মুখে তাহার ছেলেটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

বামুন-মেয়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার হাসি থামাইল। গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া বলিল, আমি বলি, তুমি এক কাজ কর বৌ। ই ত আর জলের দাগ লয় যে পুঁছে দিবে, তার চেঁয়ে— এই পর্য্যন্ত বলিয়াই দরজার চৌকাঠের বাহিরে সে ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল, তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল, ছেলে পিলে ত রাণীর প্যাটে হবেকই একদিন, না কি বল বুঁচির মা?

বুঁচির মা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হঁ, তা হবেক বই কি মা।

বামুন-মেয়ে বলিল, তাতেই বলছি বলি, উয়ার পেটের ছেলেরা আর কেনে তুমার বিষয় আশয়ের ভাগ খায় বৌ। তার-চাইতে জমি জমাগুলি তুমি ডাক্তরকে লেখাঁই লাও তুমার নামে, বুঝলে বৌ?

লক্ষ্মী বৌ ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

শুদু ঘাড় লাড়লে হবেক নাই বৌ, কেঁদে কেটে যেমন করে পার করাঁই লিতে হবেক এইটি।

লক্ষ্মী বৌ আর একবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তাই বলব।

বুঁচির মা জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগো, শুনছিলম নাকি সেই কুশ-পঁথোল না কি করবেক বলছিল—

বামুন-মেয়ে সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তা হবেক। তুমি যাও কেনে বুঁচির মা, ধুর হতে দাঁড়াই শুনে এসোগা কি হছে উখানে।

ছেলে দুটোকে অমনি নিয়ে আসবে বুঁচির মা। বলিয়া লক্ষ্মী-বৌ আবার তাহার খড়ের বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল।

এদিকে ভৈরবতলার মজলিস তখন জোর চলিতেছে। রবিবার। হরি পণ্ডিতের পাঠশালা বন্ধ। ডাক্তারের ডাক, মুখে যত রটে, কাজে তত ঘটে না। অন্যান্য সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই বেকার। সময়ের অভাব কাহারও নাই, কাজেই মজলিসের কথাবার্তা খামোকা বাড়িয়াই চলিতেছিল।

এরূপভাবে মজলিস ডাকিয়া তাহার বিবাহের কথা সাধারণে প্রচার করিবার ইচ্ছা ডাক্তারের ছিল না। কাণ্ডটি করিল হরি পণ্ডিত। এবং ডাক্তার অনর্থক এই লোকগুলার উপর রাগ করিয়া কালী ঘরের এককোণে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। লোকের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, এত বড় একটা হুজুগ পাইলে মাতে না, এমন লোক পাড়াগাঁয়ে খুব কম; অধিকন্তু সাধারণের মঙ্গলের জন্য ষোল আনার ডাক যখন পড়িয়াছে তখন তাহারা যে একটা কিছু করিবেই, ইহা সুনিশ্চিত। বেচারি জীবন ভট্চাজ মজলিসে যোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাকে পতিত করিবার কথাটা যে সম্প্রতি এই হুজুগের চাপে বন্ধ রহিল ইহা জানিয়া সানন্দে সে ভিন্নগ্রামে পেটের ধান্ধায় বাহির হইয়া গিয়াছে। রুক্মিণীর সে সব ভয় ভাবনা কিছুই নাই, মজলিস ডাকিয়া গ্রামের জনসাধারণ তাহার মঙ্গল বিধান করিবার পূর্বেই নিজের অন্তর্নিগূঢ় সত্যের কল্যাণে সে সাধারণের নাগালের বাহিরে অসাধারণের মতই নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

কিন্তু গ্রামের মধ্যে নামজাদা একটা কুলিনের সহিত মাতু-পিসির দুর্ব্যবহারের বিচার করিতে গিয়া মজলিসে মাতব্বরেরা শুধু বাজে কথায় মাতিয়া উঠিতেছিল। কোন গ্রামে নিকষ কুলিনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এই কথা হইতে হইতে রমন অধিকারী বলিয়া উঠিল, কুলিনের মান খাতির তুমরা কেমন করে জানবে হে, তুমরা ছেলেমানুষ। সে সব আমরা জানি।

সুরেন চাটুজ্যে তাঁহার কন্যারত্নটিকে কোলে লইয়া সভার ঠিক মাঝখানেই বসিয়াছিলেন, মাথার লম্বা শিখাটায় একবার হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন, বলি ওহে রামাই, তুমার মনে নাই সেই বাঁদড়ায় বিয়ে দিতে গেয়েছিলম, তুমি ত ছিলে হে! বল্লেক—আসুন, মহাশয়, আপুনকারা কুলিন কে কে আছেন এগোঁই আসুন! গেলম এগোঁই। ওরে বাবা! পাদ্য-অঘ্য দিয়ে বরণ করলেক পিথমে, তাবাদে বিদেয়।—একখানা করে ঠাসা বুনুনি বিলেতি কাপড়, আর একখানা করে পিতলের এমনি গমলা। এই বলিয়া গামলাটা কত বড় ছিল, দুই হাত দিয়া তাহাই একবার জন সাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন।

রজনী গাঙ্গুলী বলিল, সে-রকমটি আজকাল উঠেই গেইছে হে, আর দ্যাশে তেমন কুলিনও নাই।

তেবে শুন মজা। বলিয়া জগু গোঁসাই বলিতে লাগিল, গেলম ভাই বিয়ে দিতে ওই ফুলবেড়ের কাশী আচাযের। বেটারা ছিরত্তরি হে, বিটি-বেচা। বলি, তা হোকগো, কাশীতে বিয়ে, বলি, রথ দেখাকে রথ দেখা, কলা বেচাকে কলা বেচা, দুই-ই হবেক। তাবাদে শুন। দু রাত জেগে ত গেলম কাশীতে। বিয়ের রেতে পিথমে আমাদিকে খুব খাওয়ালেক বাবু প্যাট ভরে, আমপাকা, জামপাকা, কাঁটাল পাকা আরও কত কি বাবু, অত সব মনে নাই আমার। তাবাদে শুন মজা। কাশী আচাযের এক পিসতুত ভাই গেইছিল আমাদের সঙ্গে। বেটা বডা খেতে পারথো। আমপাকা খেলেক গণ্ডা পাঁচ ছয়, তাবাদে বললেক আরও দাও। বেটারা ত লারলেক দিতে। এই না রেগে বেটা গেল উঠে। তাবাদে করলেক কি, সটান বাবু কন্যাকত্তার কাছে যেয়ে বলে দিলেক, বিয়ে তুমরা ভেঙে দাও, কাশী আচায কুলিন নয়, ছিরত্তরি, উয়ারা বিটি বেচে খায়। আর যায় কুথা! বিয়ে ত গেল ভেঙে,

আবার শুদু ভাঙাই লয় হে, মেরে তেড়ে দিলেক আমাদের সবাইকে। নিয়ে ভাই, কাশীতে পুন্যি করতে যেঁয়ে কিল খিয়ে ফিরলম ঘর।

গল্প শুনিয়া অন্যে যত না হাসিল, গল্প শেষ করিয়া জগু গোসাঁই নিজেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

বেলা বাড়িতেছে অথচ কাজের মীমাংসা কিছুই হইতেছে না দেখিয়া নিতাই ডাক্তার হরি পণ্ডিতকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, ই কি হছে কি হে পণ্ডিত, মানে কথা একটো কাজের কথা হক, তা না হয় লাও উঠ।

হরি পণ্ডিত জোরে জোরে সকলকে শুনাইয়াই কথাটার জবাব দিল। বলিল, কাজের কথা আবার কি হবেক, ডাক্তার? লোক গেইছে বিধি আনতে, ভটচাজ আসুক, এলেই লাগাঁই দিছি, আবার কি?

সুরেন চাটুজ্যে জিজ্ঞাসা করিল, তাহেলে কুশপুত্তোলিই হবেক, না কি বলছ পণ্ডিত?

রমন অধিকারী বলল, তা বই কি—সেই ঠিক।

হিতু পৈতুণ্ডি কহিল, ইটো কি আবার বিয়ে হল নাকি হে? না গেলম বরযাত্ত, না খেলম ভোজ।

জনার্দ্দিন আর থাকিতে পারিল না, এত বড় ষোল আনার মজলিসে তাহার মত লোকের কথা বলিতে যাওয়া অন্যায়, এই ভাবিয়া এতক্ষণ সে চুপ করিয়াই ছিল, এইবার বলিয়া উঠিল, তাহেলে ষোল আনাকে ডাকের ময্যাদাটো কি হল পণ্ডিত? ইটো ত তুমরা ঘরে ঘরেই সেরে লিতে পারথে।

পণ্ডিত বলিল, পারথম, কিন্তুক বিয়ে করে তাখে আবার তিয়াগ করবার মতন এত বড় একটো দুদ্ধস্য কাজ, তাথেই ডাকালম ষোল আনাকে, বলি, একটো মত লিয়া যাক।

জনার্দ্দন বলিল, মেয়েটার কি হবেক ?

ডাক্তার তাহার কাছেই বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে বলিল, মানে কথা সেটো এগুতে উয়াদেরই ভাবা উচিত ছিল। টাকা দিব বলে আমাকে শেষকালতে—

কথাটা তাহার শেষ হইতে পাইল না, রমন অধিকারী বলিয়া উঠিল, হেঁ হেঁ বাবা, ভাবিতে উচিত ছিল পিতিজ্ঞে যখন।

জনার্দ্দন চুপি চুপি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, কত পাওনা ছিল ?

ডাক্তার বলিল, ছশ নগদ, আর ছবিঘে জমি।

কিছুই দেয় নাই ?

এক পয়সা না।

জনার্দ্দন বলিল, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি শুদোই আসি একবার— বলিয়া জনার্দ্দন উঠিয়া গেল।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, জনার্দ্দন, উঠছ নাকি ?

বাহির হইতে জনার্দ্দন বলিল, হুঁ, আর কি করব বসে ?

বেলাও হইয়াছিল। আজকার মতন তবে আমরাও উঠি।

বলিয়া একে একে প্রায় সকলেই উঠিয়া যাইতে লাগিল।

লক্ষ্মীনারাণ বাঁশের বাকারি দিয়া তীর ধনুক তৈরী করিতেছিল, জনার্দ্দন জিজ্ঞাসা করিল, পিসি কুথা লখাই ?

আমি কি জানি! দেখে লাও গা, বলিয়া লক্ষ্মীনারাণ নিজের কাজে মন দিল।

ভাঙা চত্বরটা পার হইয়া গিয়া জনার্দ্দন দেখিল, কয়েকটা পাকা তেঁতুল লইয়া রাণী ও লক্ষ্মীনারাণের বৌ কাড়াকাড়ি হাতাহাতি শুরু করিয়া দিয়াছে। সদ্যস্নাতা রাণীর ভিজা চুলগুলা পিঠের উপর এলানো, পরনে একটা চওড়া লাল পাড়ের ময়লা শাড়ি, অঙ্গে তাহার সদ্য এয়োতির চিহ্ন, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে নোয়া।

বসে আছে। তাহলে উয়াদিকে আমি আর কিছু বলব নাই পিসি—না, কি বল ?

মাতুপিসি বলিল, হঁ বাছা, নাড়ী-দুঃখী মানুষ আমি, অত টাকা কুথা পাই বল ত বাবা ? আর ওই যে অই হরে খাল-ভরা, উই হচ্ছে যত লষ্টের গোড়া।

ভটচাজের কাছে কুশ-পুত্তলিকার বিধি আনিবার জন্য যে লোকটা লোকপুর গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল। ভটচাজ বাড়িতে ছিলেন না, হরি পণ্ডিতের চিঠি সে তাঁহার গৃহিণীর কাছে রাখিয়া আসিয়াছে এবং ভটচাজ ফিরিলেই তিনি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন, ভটচাজ-গৃহিনী এই কথাটি লোকের মুখে বারবার করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

কিন্তু সমস্ত দিন গেল, রাত্রি গেল, পরের দিন বৈকালেও ভটচাজের দেখা না পাইয়া হরি পণ্ডিত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, বুঝি-বা আবার তাহাকে লোক পাঠাইতে হয়।

পাঠশালার ছেলেগুলা ভৈরবতলার উঠানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া নামতা ঘসিতেছিল। সূর্য ডুবিতে তখন আর বেশী দেরি নাই।

এমন সময় বকুলতলার রাস্তা ধরিয়া প্রাণবল্লভ ভাটচাজকে ভৈরবতলায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া আনন্দে হরি পণ্ডিত হাসিয়া ফেলিল। কালী-ঘরের পৈঠার উপর উবু হইয়া বসিয়া সে ঠেঙা নাচাইতেছিল, তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, এই ছাখ—ম্যাঘ চাইতেই জল !—যা রে যা, তুদের আজ ছুটি। বলিয়া মনের আনন্দে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সপাং করিয়া একটা ছেলের পিঠে হাতের ছড়িটা বসাইয়া দিয়া হরি পণ্ডিত হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ঠেঙা খাইয়াও ছেলেটা কাঁদিল না, ছুটির আনন্দে বরং খুশী

হইয়াই অন্যান্য ছেলেগুলার সঙ্গে হুটোপুটি করিয়া ছুটিয়া পলাইতেছিল, পণ্ডিত বলিল, ওরে শোন, শোন ত তোরা দুজনা!

দুইটা ছেলে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

পণ্ডিত কহিল, নিতাই-ডাক্তরকে ডেকে দিয়ে যা দেখি! আর তুঁই নিয়ে আয় আমার ঘর থেকে একঘটি জল।

প্রাণবল্লভ ভটচাজ তখন তাঁহার গামছায়-বাঁধা জিনিসপত্রগুলি কাঁধ হইতে কালী-ঘরের পৈঠার উপর নামাইয়া, ছেঁড়া চটিজোড়াটি পা হইতে খুলিয়া বাবা ভৈরবকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

হরি পণ্ডিত কহিল, আমি ত বলি ভটচাজকে আবার হয় ত লোক পাঠাতে হবেক।

ভটচাজের আর প্রণাম করা হইল না, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাজের কি আর শ্যাষ আছে হে পণ্ডিত? দু-একটো ছেলেপুলেও থাকে ত বা জানি, হঁই গেল ইদিকে, উ গেল উদিকে, ই ভাই একা আর কদিক সামালবো? তুমারও ত তাই? সন্তানাদি কিছু হল ই-পক্ষের?

কুথা পাবে ভটচাজ?—এই যে, লাও জল লাও, হাত-পা ধুঁয়ে বস, এনেক কথা আছে।

ছেলেটার হাত হইতে জলের ঘটিটি লইয়া প্রাণবল্লভ তাঁহার ধূলামাখা ফাটা পা-দুইটি বেশ করিয়া প্রথমে ধুইয়া ফেলিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে হরি পণ্ডিতের পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহলে কাজটো কি বেটে বল দেখি ভায়া? কুনু শান্তি সস্তেন-টস্তেন—

নিতাই ডাক্তার আসিয়া দাঁড়াইল।

ভটচাজ বলিলেন, এই যে, ডাক্তারবাবু যে! সব মঙ্গল ত।

আজ্ঞে, মঙ্গল আর কুথা?—ওহে পণ্ডিত, শুনো ত একবার।

পণ্ডিত উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই ডাক্তার তাহাকে একটুখানি তফাতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, আমার ভাই হঁইছে এক মরণ-মস্কিল। মানে-কথা, সেই যে কাহিনীতে আছে, মাথায় রাখলে উকুনে খায়, আর ভুঁয়ে রাখলে পিঁপুড়িতে খায়, আমার হঁইছে তাই।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিল, কেনে?

কেনে আবার? চ্যাপটার মাকে কে শিকেঁই দিঁয়েছে ক্যা জানে ভাই। কাল থেকে খালি বলছে দাও তুমার বিষয় সম্পত্তি যা-কিছু আছে, লেখে দাও সব আমার নামে, সতীন কি সতীন-বেটাকে আমি খেতে দিব নাই কিছুতেই। এই হঁইছে উয়ার বুলি। মানে-কথা, কি করি আখুন বল দেখি উপোয়?

হরিপণ্ডিত একটুখানি ভাবিয়া বলিল, দিবে নাকি?

ডাক্তার তাহার দাড়ি নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, মাইরি আর কি! নিয়ে-বাদে হাতের-পাতের লেখাঁই নিয়ে দেক আমাকে ঘাড়ে ধরে তেড়ে? কী বিশ্বাস উ-জাতটোকে ভাই, তুমিই বল ত পণ্ডিত?

পণ্ডিত আর-একবার ভাবিয়া লইল। বলিল, তা বেটে; ই-কথা মানি। তার চেঁয়ে তুমি এক কাজ কর। শুন বুদ্ধি শিকেঁই দি। চ্যাপটার মা ইবারে যেমনি বলবেক লেখে দাও; তুমিও তড়াক বলে দিও যে, হঁ, দিছি লেখে, কিন্তুক লেখে দিয়েই আমি বেরেব ঘর থেকে, হোউ কুনু ছ্যাশ বাগে চলে যাব আর ফিরব নাই, তুমি থাক জমিজায়গা নিয়ে; চুষে চুষে খাও। বুঝলে?

পরামর্শটা ডাক্তারের মনে ধরিল; বলিল, ঠিক বলেছ পণ্ডিত, আঃ! ই-কথাটো আর মনে পড়লো নাই হে তখন, তাহেলে শালীকে বলে দিথম যে!

ইবারে তাই বল। আখুন চল ত দেখি, পানবল্লব কি বলে একবার শুনি। বলিয়া হরিপণ্ডিত তাহাকে আর কোনও কথা

বলিবার অবসর না দিয়াই ভটচাজের কছে একপ্রকার টানিয়া আনিয়া বসাইল, এবং আর কোনরূপ ভনিতা না করিয়াই ভটচাজ মহাশয়কে তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জানাইয়া দিল।

প্রথমতঃ নিতাই ডাক্তার তাহার স্ত্রী-পুত্র বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করিয়াছে ইহাই একটা জানিবার মত কথা, তাহার উপর বিবাহের সপ্তাহ পার হইতে না হইতেই তাহার সে নববধূকে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা আবার ততোধিক! অথচ প্রাণবল্লভ ভট্টাচার্য্য তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। ইহার জন্য প্রথমে তিনি তাঁহার অপরিসীম দুঃখ এবং সুগভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ। কম্মটি ভাল হয় নাই ভায়া! তা হোক, মানে—'মুনিনাশ্চক মতিঃ ভমে!'

এই বলিয়া ভটচাজ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া লইলেন, তাহার পর হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর সে এক অদ্ভুতরূপে গম্ভীর করিয়া বলিলেন, কুশোপুত্তলিকা! কম্মটি কঠিন। কুশের একটি পঁথোল গড়তে হবেক, সেই পঁথোলটি হবেক ডাক্তারের ওই লতুন বৌ, ধরে লিতে হবেক বৌটি গত হঁইছে, অত্থাৎ মরেছে। তাবাদে মানুষের মিতুা হলে কিয়া কাণ্ড যা কিছু করতে হয়, ই-ক্ষেত্তেও তাই করতে হবেক। বাম্ভুন ভোজন ইত্যাদি কিছু অত্থ ব্যয় আছে। তাবাদে হঁ, একটি কথা ভুলে যেছিলম। বলিয়াই একটুখানি থামিয়া ভটচাজ তাঁহার গলার আওয়াজ হঠাৎ নামাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি দোষ আরোপ করতে হবেক ওই মেয়েটির কন্ধে। মানে একটি কারণ চাই। অত্থাৎ কাজ্জ করতে হলেই কারণ একটি চাই-ই।

ডাক্তার কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই হরি পণ্ডিত বলিয়া উঠিল, কারণ? যাক, সে-কথা আর শুনে কাজ নাই ভটচাজ।

ভটচাজ বলিলেন, না হে ভায়া, শুনতে হবেক। সেটি না শুনলে ত কাজ হবেক নাই, সেইটি হছে আসল।

হরি পণ্ডিত বলিল, বুঝতে লারছ ভটচাজ? অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে, আর এই গাঁ-গাওয়ালির সব বজ্জাত ছোকরা, চরিত্তিটি লষ্ট হঁয়ে গেইছে, মানে বিয়ের এগুতেই। শুনলে?

কথাটি শুনিবামাত্র ভটচাজের ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি সহসা কপালে উঠিয়া গেল, নিজের কাণ দুইটি নিজেই বারকতক মলিয়া হাত-জোড় করিয়া কাহার উদ্দেশে বার দুই প্রণিপাত করিলেন কে জানে, তাহার পর উপবাসক্লিষ্ট শুকন আমসির মত মুখখানি তাঁহার ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে সে এক অদ্ভুত রকমের বিকৃত করিয়া কহিলেন, এঃ রাম, রাম! ছি! ছি! তাহেলে ত কথাই নাই! বলিয়া তিনি একটুখানি থামিয়া আবার বলিলেন, লাগাও, লাগাও তাহেলে, লাগাও কুশ পঁথোল! আমি বিধি দিলম, হিয়া খোলসায় বিধি দিলম। আমি, পানবল্লভ ভটচাজ, পদ্মলোচন লায়লঙ্কারের দৌহিত্ত। যা বলব ভায়া, তা একেবারে ব্যাদ বাক্যি!

সন্ধ্যা তখনও হয় নাই, তথাপি প্রতিদিনের নিয়মমত সন্ধ্যার মজলিস জমাইবার জন্য কান্ত ও ভুতো হাসিতে হাসিতে ভৈরবতলার উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। এত শীঘ্র তাহারা কোন দিন আসে না, সম্ভবত পথে কোথাও তাহারা এই ভটচাজ মহাশয়ের শুভাগমন সংবাদটি পাইয়াছিল, এবং ইহাই বোধকরি আজিকার এই একান্ত অসময়ে তাহাদের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের হেতু।

কান্ত বলিল, পাতঃ পেনাম ভটচাজ মহাশয়!

গ্রামের এই অকালপক্ক ছোকরাগুলা অনেক সময় তাঁহাকে অনর্থক বিরক্ত করে, আজিও হয়ত সেই অপ্রীতিকর রঙ্গ-রহস্যের

জন্যই এই ছোকরা দুইটা আসিয়া জুটিল ভাবিয়া কান্তর এই মধুর সম্ভাষণে ভটচাজ মোটেই সুখী হইতে পারিলেন না, কথঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়াই বরং গম্ভীরমুখে কহিলেন, হুঁ হে, হুঁ! বলিয়াই তিনি হরি পণ্ডিতের মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খরচ খরচার হিসেবটা ইবারে ঠিক করে লও ভায়া, অন্দকার রাত, আমাকে ত আবার—

হরি পণ্ডিত মাথা নাড়িয়া বলিল, হুঁ খরচ খরচা কিছু আছে।

পিথমেই ত বিধি দেওয়ার জন্যে খুব নিকিষ্ট পক্ষে আমাকে ধর—পাঁচ। এই বলিয়াই হঠাৎ আর একজন আগন্তুকের পায়ের শব্দ পাইয়া ভটচাজ একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

আগন্তুক আমাদের জনার্দ্দন।

রাস্তা দিয়া দুইটা গরু সে ডাকাইয়া লইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ এই লোক-কয়টির উপর তাহার নজর পড়িতেই গরু দুইটা ছাড়িয়া দিয়া সে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভটচাজের কথাটা সে শুনিতে পাইয়াছিল। বিধিটা যে কিসের, সে কথা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না, এবং বুঝিতে পারিয়াই বুকটা তাহার কি যেন এক অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। জনার্দ্দন সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, যেমন আসিয়াছিল তেমনি আবার সেই আগাছার জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কান্ত জিজ্ঞাসা করিল, চললে যে হে?

আসি, বলিয়া জনার্দ্দন চলিয়া গেল।

গরু দুইটা তখন চালক অভাবে আপনমনেই কোন দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাক। তাহাদের অনুসন্ধান করিবার মত অবসর এবং প্রয়োজন কিছুই তাহার ছিল না। জনার্দ্দন সরাসর পশ্চিম পাড়ায় গিয়া উঠিল।

উঁচু একটা ঢিপির উপর কৈলাসী ঠাকরুনের ছোট ঘরখানির চতুঃসীমায় আর কাহারও ঘর ছিল না। উত্তর দিকে পচা পানায় ভর্তি একটা ছোট পুকুর। অনতিদূরে বাউরি পাড়া। তাহাদের গৃহপালিত শূকরগুলা অনবরত এই পুকুরের পাঁকে পড়িয়া থাকে। দুর্গন্ধপূর্ণ সেই ডোবাটার পাশ দিয়া কৈলাসী ঠাকরুনের বাড়ি ঢুকিবার পথ। সেইদিক দিয়া জনার্দ্দন তাহার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

কৈলাসী ঠাকরুনের বার তের বছরের বিধবা নাতনীটি তখন উঠানের একপাশে তুলসীমঞ্চের উপর মাটির প্রদীপটি নামাইয়া দিয়া ভূমিতে গড় হইয়া প্রণাম করিতেছিল।

জনার্দ্দন জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকরুন কুথা? – ঠাকরুন!

বাড়ীর ভিতর হইতে বেঁটে কৈলাসী ঠাকরুন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে থপাস থপাস করিয়া বাহির হইয়া আসিল। গায়ের চামড়া তাহার ঢিলা হইয়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলগুলা খাটো করিয়া কাটা, কপালের উপর মস্তবড় একটা সিন্দুরের টিপ।

কেনে বাবা? বলিয়া তাহার চিরদিনের অভ্যাসমত ঘাড় ও চোয়াল দুইটা সে ঘন ঘন নাড়িতে লাগিল।

কেনে আবার? তুমি কিছু করতে লারবে তাই বলে দাও গা যাও। উদিকে ভটচাজ এসেছে, কুশ পঁথোলের জোগাড় হছে, চল, চল, শীগগি চল বাপু—

জনার্দ্দন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কৈলাসী ঠাকরুন ধীরে ধীরে বলিল, লারব কেনে বাবা! যেছি না হয় তুর সঙ্গে, কিন্তুক আয়, দেখে যা। বলিয়া জনার্দ্দনকে সে একটুখানি তফাতে লইয়া গিয়া তুলসীমঞ্চ হইতে প্রদীপটা তুলিয়া

লইয়া উঠানের একপাশে পত্রবহুল ঝোপের মত একটা বোয়ান গাছের তলায় ডাকিয়া লইয়া গেল।

একে ত শাখায় পাতায় গাছের তলা হইতে উপর পর্য্যন্ত কিছুই নজর চলে না, তাহার উপর হলুদ রঙের একটা অলখলতা অষ্টে-পৃষ্টে অজস্র বন্ধনে গাছটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

প্রদীপটি মাটিতে নামাইয়া কৈলাসী ঠাকরুন বোয়ান গাছটির নীচের ডালপালাগুলি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, এই দেখ বাবা,—

জনার্দ্দন দেখিল, লতাপাতার অন্তরালে গাছের তলায় একটি ঢিপির উপর সারি সারি তিনটি মড়ার মাথা সাজান রহিয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকের কপালে টাটকা সিঁদুরের তিলক দেওয়া।

কৈলাসী ঠাকরুন ঘাড় ও চোয়াল নাড়িতে নাড়িতে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, তুখে ই সব দেখাথম নাই জনাদ্দন, কিন্তুক তুর মনে আজ অবিশ্বাস হঁইছে, তাথেই—এই বলিয়া জনার্দ্দনের মুখের পানে একবার তাহার ডাগর চোখ দুইটি তুলিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, ওই যে বাঁপাশে যিনি রইছেন, পঞ্চাশ বছর এগুতে একদিন অমাবস্যা রবিবারে উনি মরেছিলেন গলায় দড়ি দিঁয়ে, আর ওই যে মদ্যিখানে, উনি একটি সধবা মেয়ে, নদীর বানে ভেঁসে এসেছিলেন, আর, এই ধারে এই ইঁয়ার মিত্তু হঁইছিল, সে এক ভারি মজার কথা জনাদ্দন, অকুমারী এক গরীব বাম্ভুনের কন্যা, নাম ছিল সোয়াগী, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বাপে বিয়া দিতে লারলেক, তাবাদে বয়েস যখন উয়ার সতর, তখন এক বজ্জাত লোক গেল জোর করে উয়াকে নিয়ে পলাঁই, পাঁচটি বছর তার কাছে ছিল, কিন্তুক বাছা, পাঁচটি বছর কেটেছিল যেমন পাঁচটি যুগ, কত কষ্ট যে সঁয়েছিল সোয়াগী, সে সব কথা বলতে গেলে আজ আর সারা রেতে ফুরোবেক নাই, অনেক

দুঃখু কষ্ট সয়ে বাবা, শেষকালতে অভাগী মরে দিলেক একদিন বিষ খেঁয়ে।

এই পর্যন্ত বলিয়া কৈলাসী ঠাকরুন তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি একবার মুদ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, ওই সোয়াগীকে ডাকলম, বললেক আমি দিব সব ঠিক করে, তুর ভাবনা নাই মা!

আমি বললম, মাতুর কাছে দশটি টাকা নিয়েছি বাছা, দেখিস আমার মান সম্ভম রাখিস তুঁই।

সোয়াগী বললেক, খাতির জমা।

তাথেই ওই রামচন্দর কানি দিঁয়েছি বাবা, সোয়াগীর মোহিনী মন্তর। একদিনের তরেও ডাক্তরকে আসতে হবেক।

জনার্দ্দন অবাক হইয়া সমস্ত শুনিল। ইহাকে সে যে অবিশ্বাস করিয়াছে সেজন্য মনে মনে অনুতাপ করিল। তাহার পর ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে একবার তাকাইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, কিন্তুক ঠাকরুণ, ভটচাজ আনাই ঠিকঠাক করছে যে উয়ারা! কুশ পঁথোলটি বন্দ করতে হবেক যে!

কুশ পঁথোল? হুঁ—বলিয়া কৈলাসী ঠাকরুন তাহার ঘাড় চোয়াল নাড়িয়া কহিল, তাহলে বলতে হবেক আমার ওই পেতাপ রায়কে। এই বলিয়া আঙুল বাড়াইয়া বাঁপাশের মড়ার মাথাটিকে সে দেখাইয়া দিল।

জনার্দ্দন বলিল, তবে তাই বল ঠাকরুন!

না বাছা। সে ত আমি লারব এখন। উয়াকে পাঠাঁইছি আমি একটো কাজে। সেখান থেকে ফিরেঁই আনতে হলে লাগবেক লগদ একশ টাকা তার কমে লয়, বলিয়া কৈলাসী ঠাকরুন চুপ করিয়া রহিল।

জনার্দ্দন জিজ্ঞাসা করিল, একশ টাকা দিলে উনি পারেন?

ঘাড় নাড়িয়া কৈলাসী ঠাকরুন বলিল, উকথা বল না বাবা, আমার পেতাপ রায় লারে, এমন কাজ কিছু নাই পিথিমিতে।

এতক্ষণ গল্প শুনিয়া সে বিশ্বাস জনার্দ্দনের হইয়াছিল। বলিল, তাহলে উঠি আজকার মতন। শুদাইগা পিসিকে, যদি পারে দিতে।

হুঁ বাছা, তাহেলে এস।

কৈলাসী ঠাকরুন প্রদীপটি পুনরায় হাতে তুলিয়া লইয়া সেখান হইতে উঠিল।

জনার্দ্দন চলিয়া যাইতেছিল, ঠাকরুন অতিশয় সন্তর্পণে সাবধান করিয়া দিল, যেন এ সব কথা সে কাহারও কাছে কোনদিন প্রকাশ না করে, এবং তাহার পেতাপ রায় যে অত্যন্ত রাগী মানুষ, রাগিলে মানুষের সকল রকম অনিষ্ট যে সে অনায়াসে করিয়া ফেলিতে পারে, এ কথাটাও সে তাহাকে আগে হইতে বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে ভুলিল না।

রাস্তায় আসিতে আসিতে জনার্দ্দন রাণীর কথা ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত নিরীহ এই মেয়েটার কপালে কি আছে কে জানে!—সঙ্গে সঙ্গে লক্ষী বৌএর কথাও যে ভাবিল না তাহা নয়। কাহারও কষ্ট সে সহ্য করিতে পারে না, এবং ইহাই তাহার স্বভাব। মানুষগুলা অনর্থক কষ্ট ভোগ করিবার জন্য কেন যে এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে, এই কথাটা সে বহুবার আপন মনেই ভাবিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা সে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। মানুষ এমন কি পাপ করে, কোন বস্তুটা যে তাহাদের এই অবাঞ্ছিত মন-বেদনার হেতু, সে সব কথা জনার্দ্দন কিছুই বুঝিতে পারে না। অপরের দুঃখ-কষ্টে তাহার নিজেরই অন্তরের মধ্যে কোথায় একটা নূতন বেদনার উদ্ভব হয়

এবং সেই ব্যথার যন্ত্রণায় সে কোনপ্রকারেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, দিকচিহ্নহীন অন্ধকারের মধ্যে অন্ধ যেমন করিয়া পথের সন্ধানে হাতড়াইয়া বেড়ায় সেও ঠিক তেমনিভাবে ইহার প্রতিকারের চেষ্টায় ছটফট করিয়া মরে।

অন্ধকার পল্লীর সেই জনহীন পথ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে জনার্দ্দন ভাবিতেছিল, অদ্ভুত ক্ষমতা এই কৈলাসী ঠাকরুনের! যে মানুষ মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের দিয়া নিজের ইচ্ছামত অসাধ্য সাধন সে যদি করাইতে পারিত, ওই প্রতাপ রায়, ওই সোহাগী, যদি তাহার নিজের হইত, তাহা হইলে একশ টাকা ত দূরের কথা, একটি পয়সা না লইয়াও সে কত কি করিতে পারিত! এই গ্রামখানার মধ্যে কাহারও কোনও অভাব থাকিত না, দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, এই সব আপদগুলাকে সে বহুদূরে তাড়াইয়া দিত, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে দিন কাটিত সকলের। কৈলাসী ঠাকরুনের অন্তরে এতটুকু মায়া দয়া নাই!—থাকিলে হয়ত সে এমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত না।

এমনি সব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে জনার্দ্দন এক সময় মাতুপিসির ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল পুকুরের পাড়ে গাছপালাগুলার আড়ালে আলো হাতে লইয়া কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জনার্দ্দন সেই দিকে একটুখানি অগ্রসর হইতেই দেখিল, ঘাটের উপরে একটা 'লম্ফ' হাতে লইয়া মাতুপিসি দাঁড়াইয়া, আর খেজুরগাছ দিয়া বাঁধান একটা পৈঠার উপর বসিয়া রাণী বাসন মাজিতেছে।

মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়া মাতুপিসি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কে?

বাসন মাজিতে মাজিতে রাণী একবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইল।

জনার্দ্দন বলিল, আমি আবার এলম পিসি তুমার কাছকে।

আয় বাবা, তুখেই আমি খুঁজছিলম। গাঁয়ের লোকগুলা সব বজ্জাত বাবা, সবাই আমার শত্তু—বলিয়া মাতুপিসি তাহার হাতের লম্ফটি মাটিতে নামাইয়া দিয়া তাহার দিকে একটুখানি সরিয়া আসিল। ভটচাজ ডাকিয়া হরিপণ্ডিতের পরামর্শে নিতাই ডাক্তার যে তাহার কন্যাকে পরিত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছে, কথাটা ইহার মধ্যে তাহার কাণে গিয়া উঠিয়াছিল। বলিল, কুশ পঁথোলের জোগাড় শুনলম হেঁ বাবা, ই কথা কি সত্যি জনাদ্দন ?

অদূরে কর্মরতা ওই মেয়েটার সাক্ষাতে কথাটার জবাব দিতেও জনার্দ্দনের কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, তাই সে অতি সন্তর্পণে ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিল, হুঁ পিসি। এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার কহিল, আমি গেইছিলম কৈলাসী ঠাকরুনের কাছকে।

কথাটা সে যত আস্তে বলিল, আগ্রহাতিশয্যে মাতু পিসি তাহার চতুর্গুণ জোরে প্রশ্ন করিল, গেইছিলি ? বাবা গেইছিলি ? কি বললেক ?

জনার্দ্দন বলিল, যেখান থেকে যেমন করে পার পিসি, তুমি একশটি টাকা আজকেই জোগাড় করে দাও।

মাতুপিসির টাকার অভাব ছিল না, তথাপি কথাটা শুনিয়া মুখখানা তাহার কেমন যে একপ্রকার বিবর্ণ হইয়া গেল, অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, কেনে বল দেখি বাবা ? কেনে ?

জনার্দ্দন আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, দিতে হবেক কৈলাসী ঠাকরুনকে।

মাতুপিসি কোনও জবাব না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জনার্দ্দন আবার বলিল, তাহেলে উ কুশ পঁথোল বন্দ করে দিতে পারে, তা না হলে কিছুতেই লারবেক।

মাতুপিসি জিজ্ঞাসা করিল, ক কুড়ি দিতে হবেক বাছা?

পাঁচ কুড়ি বলিয়া জবাবের অপেক্ষায় জনার্দ্দন সাগ্রহে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

মাতুপিসি চোখ দুইটা তাহার কপালে তুলিয়া বলিল, পাঁচ কুড়ি! আধ কুড়ি টাকা লগদ আমি গুণে দিয়েছি বাবা উয়ার হাতে। আবার শ্যাষ কালতে যদি সবশুদ্দো নিয়ে বলে যে, আমি লারব? তখন?

বোয়ান ঝোপের নীচে সিঁদুর মাখান নরমুণ্ডগুলা আর একবার তাহার চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল। জনার্দ্দন বলিল, তুমি জান না পিসি, কৈলাসী ঠাকরুন সব পারে।

মাতুপিসি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, পথের ধারে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল, সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, হঁ, তা পারে। কিন্তুক—বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া হাত নাড়িয়া সে আবার বলিতে লাগিল, কিন্তুক বাছা, তার চাইতে আমি বলি কি শুন। টাকা পাঁচ কুড়ি আমি দেখি কুথাম পারি যদি জোগাড় করতে। তাবাদে—

এই পর্যন্ত বলিয়া মাতুপিসি চুপ করিয়া আবার কি যেন ভাবিতে আরম্ভ করিল।

জনার্দ্দন বলিল, তাবাদে কি করবে তুমি?

আমি বলি কি, টাকা উয়াকে কেনে খাওয়াব বাছা, আমার বিটি জামাই-ই খাক। তুঁই বাবা লেতাইকে আমার কাছে একবার ডেকে দে। উয়ার হাতেই টাকা শ'টি দিঁয়ে আমি লিশ্চিন্দি হই। হেই বাছা! বলিয়া মাতুপিসি জনার্দ্দনের হাতখানি একবার চাপিয়া ধরিতে গেল।

জনার্দ্দন বলিল, যদি সে না আসে পিসি, যদি বলে, সব টাকা একসঙ্গে না হলে আমি লিব নাই ?

মাতুপিসি কহিল, সব টাকা আমি কুথা পাই বল ত বাবা ? টাকা বড় আঁতের জিনিষ রে ! একটি টাকা কুথাম বিস্তিরিজ হয় ত মনে হয়, লাড়ে পাক দিঁয়ে দিলেক।

একথার জবাবে আর কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া জনার্দ্দন চুপ করিয়া রহিল।

মাতুপিসি বলিল, তেবে তুঁই যা বাবা, আখুনি ডেকে আন আমাদের লেতাইকে, আমি দি বাবা টাকাগুলি তাখে গুণে।

জনার্দ্দন বলিল, অই লও ! চাক ঘুর ঘুর করি আর কি আমি সারাদিন ! তবে তাই দেখি যদি আসে, বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি চলিয়া গেল।

ভৈরবতলায় ডুগি তবলার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। কালীঘরের উপরে আলো জ্বলিতেছিল। জনার্দ্দন একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, কিন্তু নিতাই ডাক্তারকে দেখিতে পাইল না।

ঘরের দরজায় একবার ডাক দিতেই ডাক্তার বাহির হইয়া আসিল।

জনার্দ্দন বলিল, আমার সঙ্গে তুমাকে একবার যেতে হবেক ভাই।

কুথাকে হে ?

এস তুমি—বলিয়া জনার্দ্দন তাহার হাতে ধরিয়া এক প্রকার টানিতে টানিতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার ভাবিল, নিশ্চয় কোনও রোগী দেখিবার জন্য সে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছে ; বলিল, টালিসক্রুপটো যে আনলম নাই হে সঙ্গে করে ? মানে কথা, রুগীর নিমনিয়ার ক্যাশ যদি হয়, তা হলে ত—

না হে, তুমার উ সব যন্ত-টন্ত আনতে হবেক নাই,—চল—বলিয়া জনার্দ্দন তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভৈরবতলাটা প্রথমে পার হইয়া আসিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, ভটচাজকে কি বিদেয় করে দিলে নাকি হে ডাক্তার ?

ডাক্তার বলিল, হুঁ ভাই! বলি, দেখি বুজে সুজে। মানে কথা, কুশ পঁথোলটি ত আর সামান্য লয়, দস্তুরমত খরচ আছে। পানবল্লব ত বল্লেক আখুন শতখানেক চাই, তাবাদে হতে করতেই কুন না হ্যাড়শতে যেঁয়ে ডাঁড়াবেক তাই বা কে বলতে পারে! মানে কথা, তাথেই বলি ত দেখি ভেবে চিন্তে—

জনার্দ্দন বলিল, কাজ নাই আর উ কাজ ক'রে, বুজলে ডাক্তার ? তার চেঁয়ে তুমি লাও একশ' টাকা।

টাকা লইবার কথা শুনিয়া আগ্রহাতিশয্যে ডাক্তার বলিয়া উঠিল, কে দিছে ? কে দিছে টাকা ?

জনার্দ্দন বলিল, তুমি এসই না হে আমার সঙ্গে।

এইবার ডাক্তারের সন্দেহ হইল। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, উয়ারা কিছু বলেছে নাকি তুমাকে ?

কথাটা বলিয়া ফেলিলে পাছে সে না যায় ভাবিয়া জনার্দ্দন চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু ডাক্তারের সন্দেহ তাহাতে আরও বাড়িয়া গেল। বলিল, বল না ভাই ? মানে কথা, সত্যি কথা বলতে কি তুমাকে—বিয়ে আমার করা শুধু ভাই ওই উদ্দ্যাশে, তা উ-মাগী আমাকে দিলেক খুব শাস্তি যাহক!

এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা উভয়ে আসিয়া যে পথে মাতুপিসির ঘরে যাইতে হয় সেইখানে দাঁড়াইল। ডাক্তারের আর কোনও সন্দেহ রহিল না। চুপি চুপি কথা বলিতে গিয়া জনার্দ্দনের কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল, কিন্তুক ভাই মানে কথা, আমি ওই বাসক ঝুঁপে দাঁড়াই রইব, উয়ার ঘর ঢুকব নাই।

জনার্দ্দন বলিল, না হে না, তাই কি হয় কখনও!

ডাক্তার কহিল, মানে কথা, বুঝতে লারছ তুমি জনার্দ্দন! যদি কারু লজরে পড়ে ত সেটো মানে কথা, গাঁয়ের মধ্যে আমার একটো 'পজিসেন' রইছে, ডাক্তার বলে কথা, তুমি বলছ কি হে।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তারকে ঘরেও ঢুকিতে হইল না, বাসক ঝোপে দাঁড়াইয়া থাকিতেও হইল না। মাতুপিসি কেরোসিনের লম্ফটি হাতে লইয়া তাহাদেরই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মাতুপিসির পশ্চাতের অন্ধকারে রাণী দাঁড়াইয়া ছিল, ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া সে ছুটিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় মাতুপিসি খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার কাপড়ের আঁচলটা টানিয়া ধরিল; বলিল, দাঁড়া! বাঘ লয়, গিলবেক নাই।

যাহারা আসিতেছিল তাহারা মানুষ, বাঘও নয় এবং গিলিবার আশঙ্কাও কিছু ছিল না, তথাপি হাড়িকাঠে বাঁধা ছাগলগুলা গলার দড়ি লইয়া প্রাণের ভয়ে যেমন করিয়া টানা-হেঁচড়া করে, রাণীও তাহার কাপড়টা ঠিক তেমনিভাবে তাহার মায়ের হাত হইতে টানিয়া ছাড়াইয়া লইবার জন্য অতিমাত্রায় ধস্তাধস্তি ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়া দিল।

মাতুপিসির এক হাতে লম্ফ, একটা হাত দিয়া রাণীর কাপড়টা সে বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অনেক টানাটানির পর, ডাক্তার যখন নিতান্ত সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, লজ্জায় ও রাগে রাণী তখন তাহার মায়ের এই অন্যায় অত্যাচার আর কোন প্রকারেই বরদাস্ত করিতে না পারিয়া দুই হাত দিয়া সজোরে একটা হেঁচকা টান মারিয়া তাহার মাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল এবং প্রায় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ছুটিয়া পলায়ন করিল। যাইবার সময় যে অভদ্র গালি সে মুখ

দিয়া উচ্চারণ করিয়া গেল, মাতুপিসি তাহা শুনিতে পাইল না। সে তখন জামাতার সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় খানিকটা জিব বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

টাকাগুলি হাতে লইয়া একবার গণনা করিয়া ডাক্তার বলিল, ই আমি লিব নাই। আর কই?

মাতুপিসি তাড়াতাড়ি তাহার জামাই-এর একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, দিব বাছা, সব দিব, ধান চালগুলি বিচে-কুচে যা পাই সব তুমাকে দিব বাবা, তোমার হাতে আমার বিটিকে সমপন করেছি, তুমি কি আমার অনহেলা করবার জিনিস বাবা? বলিতে বলিতে শুষ্ক চক্ষু দুইটা চাপা দিয়া মাতুপিসি হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ডাক্তার তখন তাহার হস্তধৃত টাকা ও নোটগুলি সযত্নে কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া এদিক-ওদিক বারকতক তাকাইয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে! জনার্দ্দন এতক্ষণ তাহাকে কোন কথাই বলে নাই, এইবার সেও একবার তাহার হাতে ধরিয়া বলিল, হেই ভাই, মাতুপিসির হঁয়ে আমিও তুমার হাতে ধরে বলছি, ওই কুশ পঁথোল টথোল, উ-গলা যেমন আর না হয়। বুঝলে?

কথাটা মাতুপিসিরও একবার বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অবসর না পাইয়া কান্নার সুর সে আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া তাহার এই মনের কথাটি প্রকাশ করিতে লাগিল।

জনার্দ্দনের দিকে ফিরিয়া ডাক্তার কহিল, তা আমি বলতে লারলম ভাই, যতক্ষণ না সব টাকা পেছি।

জনার্দ্দন বলিল, পাবে বৈ কি ভাই, তেবে টুকছেন রঁয়ে বসে লিতে হবেক।

ডাক্তার পিছন ফিরিয়া চলিতে চলিতে বলিল, তা না হয় হল, মানে কথা, কুশ পঁথোল না হয় বন্দ করলম, কিন্তুক সব টাকা যতদিন না পেছি ভাই, ততদিন আমি উয়াকে গেহন করতে লারব, ই কথা ঠিক্। মানে কথা, আমার কাছে সব সাফ-রাফ, তা সে যে যা-ই বলুক।

পথে আসিয়া ডাক্তারকে জনার্দ্দন আর একবার সবিনয়ে অনুরোধ করিল।

ডাক্তার বলিল, আমার ভাই ভীষ্মের পিতিজ্ঞে!

তাহার পর পুরা দেড়টি মাস সব চুপ চাপ। কোনও তরফেই কোনও কথা নাই। না মাতুপিসির, না ডাক্তারের।

লক্ষী-বৌ দিন কতক মাতিয়াছিল। পাড়া-পড়শীর কথা শুনিয়া জমি-জমা তাহার নিজের নামে লেখাপড়া করাইয়া লইবার জন্য ডাক্তারের কাছে প্রতিদিন সে বায়না ধরিত। স্বামী যায় যাক, পেটের ভাত যেন না যায়! অবশেষে ডাক্তার যেদিন রুখিয়া উঠিল, যে, মানে কথা, সে নিজে তাহা হইলে বাড়ি ঘর সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে, সেই দিনই এই অপ্রীতিকর বিপত্তির মীমাংসা হইয়া গেল। লক্ষী-বৌ আর কাহারও কথা শুনিল না। বলিল, না বোন, ওকেই যদি না পেলাম, তা হলে কাজ কি আমার জমি জায়গায়?...

ডাক্তার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। হরিপণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের তারিফ করিয়া আড়ালে গিয়া আপন মনেই একটুখানি হাসিয়া লইল।

তাহার পর ডাক্তার রোজই প্রায় দু বেলা ভৈরবতলায় গিয়া বসে। কোনদিন বা হেঁট মুখে উবু হইয়া বকুল গাছের ছায়ায়

বসিয়া থাকে, কাঠি দিয়া পথের ধূলার উপর আঁচড় কাটে, আর ভাবে. .এক একবার মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক তাকায়।···

এমনি করিয়াই ফাল্গুন গেল, চৈত্র গেল।

সেদিন সংক্রান্তি। বাবা কাল ভৈরবের গাজন উৎসব। সমস্ত গ্রাম মাতিয়া উঠিয়াছে। ছেলেরা আজ সং সাজিবে, কালি মাখিবে, বুড়ারা নাচিবে, গাহিবে, আনন্দ করিবে, আর মেয়েরা তাই সাজ-সজ্জা করিয়া, পান খাইয়া, কাচ্চা-বাচ্চাগুলাকে কোলে পিঠে লইয়া দেখিয়া আসিবে। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটা ময়দানের উপর এই সমারোহ।

সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া তুপুর হইতেই ময়দানে লোক জড় হইতে শুরু হইয়াছিল। তুইটা পানের দোকান, একটা মুড়ি কলাই ভাজার, আর একটা তেলে ভাজা পাঁপড় বেগুনির।

বৈকালের দিকে 'মেলা'টা জমিল ভাল।

তারপর 'মেলা' যখন ভাঙিল, সূর্য তখন অস্ত গিয়াছে। উত্তর দিকে শালবনের পাশে শিয়াল ডাকিতেছিল।

গ্রামের মেয়েছেলে একে একে সকলেই গ্রামে ফিরিতে লাগিল। ছেলেতুটাকে বুঁচির মার সঙ্গে বিদায় করিয়া দিয়া ডাক্তার বলিল, ময়নাবুনির ডাকে চললম আমি, ঘরে বলে দিস। মানে কথা, তা না হলে ভাববেক। কিন্তু .ময়নাবুনির ডাকে সে গেল না। লোকজনের ভিড় ঠেলিয়া অতি সন্তর্পণে গ্রামের বাহিরের মেঠো রাস্তা ধরিয়া পুনরায় সে গ্রামের দিকেই ফিরিয়া আসিল। মাতুপিসির দরজার স্নমুখে পুকুরের পাড় দিয়া যে সোজা রাস্তাটা গ্রামে গিয়া ঢুকিয়াছে, ডাক্তার কি ভাবিয়া হঠাৎ সেই রাস্তাটাই ধরিয়া বসিল। এদিকে ঠিক এমনি সময়ে রাণীও গাজন দেখিয়া ঘরে ফিরিতেছিল। দরজার স্নমুখে সহসা তাহাদের মুখোমুখি দেখা।

অন্ধকার সেই সুড়ঙ্গের পথে রাণীর চাবি-বাঁধা আঁচলের খুঁট ধরিয়া ডাক্তার সজোরে তাহাকে আকর্ষণ করিতেই, ভয়-বিকৃত চাপা গলায় রাণী কহিল, আঃ, ছাড়্‌ !

নিতাই ভাবিল, অন্ধকারে হয়ত সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। বলিল, আমি ডাক্তার।

কিন্তু ডাক্তারের খাতির আর সেদিন কিছু রহিল না! রাণী তাহার কম্পিত হস্তমুষ্টি নিমেষেই শিথিল করিয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইল। টানে টানে ডাক্তারও তাহার পিছন ধরিল।

দুইটি করতল একত্রিত করিয়া মুখ দিয়া কিরূপে ঘুঘু ডাকিতে হয়, গত কয়েক দিবস হইতে লক্ষীনারাণ তাহাই অভ্যাস করিতেছিল। ঘরের চালায় দাঁড়াইয়া আজও সে 'ঘুঘুচ্চু' 'ঘুঘুচ্চু' করিতেছে, এমন সময় রাণীর পশ্চাতে কাহাকে যেন সে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ?

ডাক্তার পালাইতে পারিল না। বলিল, কি হে ভায়া! আমি!

নিতাই এর গলার আওয়াজ শুনিয়া মাতুপিসি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, আনন্দে অধীর হইয়া প্রথমে সে যে কি বলিবে, কি করিবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। অবশেষে একটুখানি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, আজ আমার কত সুভাগ্যি বাবা, না ডাকতেই পেলম। এস বাবা এস, লিতাই এস। ওরে লক্ষীলারাণ, ঘরকে নিয়ে আয় বাছা, লিতাইকে বসতে দে!

এই বলিয়া মাতুপিসি যেমন আসিয়াছিল, আবার তেমনি দ্রুত-বেগে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া, মাটির একটি ছোট ভাঁড় হইতে হলুদ-রঙা একটুখানি কাপড়ের টুকরা লুকাইয়া হাতে লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

পাশের ঘরে রাণী বসিয়া ছিল। মাতুপিসি তাড়াতাড়ি তাহার মাথার খোঁপায় কৈলাসী ঠাকরুনের দেওয়া সেই ন্যাকড়াটি গুঁজিয়া দিয়া বলিল, কাপড় ছাড়গা, আর, মাথায় টুকছ্যান ত্যাল দিয়ে আয়, দেখসে আয়, কে এসেছে। বলিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া সেখান হইতে তুলিয়া দিয়াই মাতুপিসি বাহিরে আসিয়া দেখিল, নিতাই তখন বাহিরে তক্তাপোশের উপর বেশ করিয়া চাপিয়া বসিয়াছে। আনন্দে পিসি তখনও কি যে বলিবে, কি করিবে কিছুই ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

এই যে বাবা, বস বাবা বস জল খাও। রাণী! রাণী! বলিতে বলিতে সে আবার ঠিক তেমনিভাবেই ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখে এক বিপরীত কাণ্ড। রাণী কাপড়ও বদলায় নাই, জামাও পরে নাই, গুম হইয়া একজায়গায় কাঠের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে গিয়া মাতু বলিল, ও কি লো, কাপড় ছাড়।

রাণী বলিল, না।

না কি লা, লিতাই এসেছে। যা, কাছকে যা।

রাণী আবার বলিল, না।

মাতু এবার একটু নরম হইয়া রাণীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, ছি মা ছি, না বলতে নাই। ও তোর সোয়ামী।

রাণী এবার আরও জোরে জোরে বলিয়া উঠিল, না না সোয়ামী নয়, ও আমার কেউ নয়। ও মানুষ নয়, ও একটা জানোয়ার।

চুপ, চুপ, শুনতে পাবে। এই বলিয়া মেয়েকে আর না ঘাঁটাইয়া জামাইকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

জামাইকে ঠাণ্ডা করিতে প্রয়োজন হইল না। মাতুকে দেখিয়া

নিতাই ডাক্তার হাসিতে হাসিতে বলিল, বলুক বলুক, ওর যা খুশী তাই বলুক।

মাতুপিসি ভাবিল, কৈলাসী ঠাকরুনকে দশ টাকা দেওয়া বৃথা হয় নাই।

চালার একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া লক্ষীলারাণ তখনও তাহার হাত দুইটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া ডাকিতেছে, ঘু—ঘু—চ্চ্…
ঘু—ঘু—চ্চ্…

অপরূপা

একটা পা থাকে কাঠের ওপর, আর একটা পা থাকে মাটিতে। সুমুখে ঝুঁকে পড়ে অবিনাশ হাত দিয়ে করাত চালায়। অবিনাশ কাঠের ওপর করাত চালায় আর গান করে।

ইস্পাতের তৈরি ছোট করাত। দেখতে দেখতে ছোট ছোট কাঠ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপর বাটালি, রঁ্যাদা, ভ্রমর—ছোট ছোট কত রকমের কত যন্ত্র চালায় অবিনাশ। তাই দিয়ে কত রকমের কত খেলনা তৈরি করে। এইবার রং আসে, তুলি আসে, কাঠের খেলনা কত রকমের কত রং-বেরঙে বিচিত্র হয়ে ওঠে।

অবিনাশের সাজ-পোশাকও বিচিত্র। পা পর্যন্ত লম্বা রঙিন আলখাল্লা! মাথায় কালো কোঁকড়ানো এক মাথা বাবরি চুল।

প্রভাতের সোনালী আলো এসে পড়ে অবিনাশের আলখাল্লার ওপর। চুলের গোছা বাতাসে উড়তে থাকে।

অবিনাশের গলাটি বেশ মিষ্টি। গান গায় চমৎকার। চেহারাও মন্দ নয়। জাতে বৈষ্ণব। বলে, বোরেগী আমরা।

গান গেয়েই অবিনাশ হয়ত তার জীবিকা উপার্জ্জন করতে পারত; তার বাপ-পিতামহ তাই করেছে, কিন্তু অবিনাশের প্রকৃতি যেন তাদের থেকে একটুখানি স্বতন্ত্র। ছেলেবেলা থেকে তার ঝোঁক পড়ল, সে পুতুল গড়বে। মাটি দিয়েই শুরু করেছিল তার, শিল্পকর্ম। কিন্তু মাটিতে শেষ পর্যন্ত তার সুবিধে হল না। ধরলে কাঠ। সেই থেকে সে কাঠ দিয়ে পুতুল গড়ছে। পুতুল

গড়ছে, খেলনা গড়ছে, বাঁদর গড়ছে, ব্যাং গড়ছে, গরু ছাগল ভেড়া যখন যা খুশী, তাই দিয়েই তার মনস্কামনা পূর্ণ করছে।

অবিনাশ বলে, গান গেয়ে দোরে দোরে ভিক্ষে করার চেয়ে পুতুলগড়া অনেক ভাল।

কাঠের কাজ সে শিখেছেও চমৎকার। নানা রকমের কাঠের খেলনাগুলি রং দিয়ে রাঙিয়ে উঠোনের রৌদ্রে যখন শুকতে দেওয়া হয়, একবার নজর পড়লে সেদিক থেকে কেউ আর চোখ ফেরাতে পারে না।

অবিনাশ শিল্পী—তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু গান?

অবিনাশ বললে কি হবে? গান গাইব না বললেই কি গান গাওয়া বন্ধ থাকে? গলা দিয়ে গান তার অজান্তে বেরিয়ে আসে।

কাজ করতে করতে অবিনাশ গুন গুন করে গান গায়। তারপর সেই কাঠের পুতুলের ওপর রঙের তুলি যখন চলে, শুকনো কাঠ যখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, শিল্পীর সর্ব দেহমনে যখন আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়, তার সে দুর্দমণীয় গতিবেগ রোধ করা কঠিন হয়ে ওঠে। নিজেরও অজান্তে তার কণ্ঠ ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে, বিচিত্র সুরলহরী। আত্মহারা শিল্পী তখন নেশার ঘোরে যেন তন্ময় হয়ে উঠে।

চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের দিনে অবিনাশের আলখাল্লায় গোলাপী রঙের আমেজ ধরে। বাবরি চুলের ওপর গুলঞ্চের মালা দোলে। পায়ে বাঁধে ঘুঙুর, আর হাতে নেয় গোপীযন্ত্র, তারপর

সারাদিন সে গ্রামের পথে পথে নেচে নেচে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়।

সারা গ্রামখানিকে মাতিয়ে রাখে একা অবিনাশ। ছেলে বুড়োরা তাকে ছেঁকে ধরে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

অবিনাশ বলে, এবার ছেড়ে দাও রাজাবাবুরা। এখনও দক্ষিণপাড়া বাকি, পুব পাড়া বাকি, তাদের শোনাইগে যাই।

ছোট ছেলেটিকে পর্যন্ত হাত জোড় করে প্রণাম করে অবিনাশ। তার ছেলে বুড়ো সবাইকে বলে, রাজাবাবু।

দক্ষিণপাড়ায় যাব বলে যায় বটে, কিন্তু পথের মাঝে বাধা পড়ে। সদ্য-বিবাহিতা এক যুবতী ছুটতে ছুটতে এসে তার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, আমাদের বাড়ি এস আগে, তারপর যেখানে খুশী যাবে।

চন্দ্রমুখীদের মস্ত বড় দালান বাড়ি। বাড়ি বড়, তার উঠোনও বড়। পাড়ার বৌ ঝি, যারা বড় একটা বাড়ির বার হয় না, তারাই এসে জুটেছে সেখানে, অবিনাশের গান শোনবার জন্যে।

একজন জিজ্ঞাসা করে বসল, তোমার বৌএর সন্ধান কিছু পেলে অবিনাশ? অবিনাশের ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠল। নাগো মেয়ে, সন্ধান আমি করিনি।

কে যেন বললে, কেন, অমন সুন্দরী বৌ তোমার, পালিয়ে গেল ত একবার খুঁজে দেখলে না?

অবিনাশ বললে, না। আমাকে ছেড়ে যে পালিয়ে গেল, তাকে আমি খুঁজতে যাব কেন দিদিমনি?

কথাটা সত্যি।

মেয়েটার নাম ছিল সুন্দরী। নামেও সুন্দরী, দেখতেও সুন্দরী। অবিনাশ কিছু কদাকার কুৎসিত নয়।

মেয়েরা তাই বুঝতে পারে না, হতভাগী পালালে কেন? অবিনাশও বুঝতে পারে না।

সুন্দরীকে সত্যিই সে ভালবাসত। কিন্তু সুন্দরী সে কথা বিশ্বাস করত না। বলত, তোমার ভালবাসা না ছাই। আমার চেয়ে তুমি বেশী ভালবাস তোমার ওই পুতুলগুলোকে।

অবিনাশ বলত, কি যে বল তুমি পাগলের মত! ওগুলো কাঠের তৈরি—নির্জীব, আর তুমি আমার জ্যান্ত পুতুল। তোমাকে ছেড়ে ওদের আমি ভালবাসতে যাব কেন?

একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল অবিনাশের।

সে এক দুরন্ত শীতের রাত।

মাটির একটা পাত্রে গনগনে কাঠের আগুন মেঝের ওপর নামান। দুপাশে দুজন। একপাশে অবিনাশ, আর এক পাশে তার বৌ সুন্দরী।

ভালবাসার কথাই হচ্ছিল তাদের। সুন্দরী বললে, না না, তুমি আমাকে ভালবাস না। ওসব তোমার মুখের কথা।

অবিনাশ বললে, ভালবাসি না?

সুন্দরী বললে, ছাই বাস।

—বাসি না?

—না।

—এখনও বলছ?

সুন্দরী বললে, হ্যাঁ, এখনও বলছি। চিরদিন বলব।

অবিনাশ বললে, দেখবে?

—কি দেখব?

—এই দ্যাখ—

বলে, জলন্ত আগুনের খাপরায় অবিনাশ তার বাঁ হাতের একটা

আঙুল দিলে ডুবিয়ে। চোখ দুটো বড় বড় করে দাঁতে দাঁত চেপে একদৃষ্টে সে সুন্দরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুন্দরী একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতটা তার টেনে তুলে দিলে। আঙুলটা তখন বেশ পুড়ে গিয়েছে।

আঙুলে ফোসকা পড়ল, ঘা হল, আবার দেখতে দেখতে সেরেও গেল। রইল মাত্র একটা সাদা দাগ।

সে দাগ তার এখনও রয়েছে।

বাঁ হাতের সেই পোড়া আঙুলটার দিকে অবিনাশ তাকিয়েছিল। একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সুন্দরীর বাপের বাড়িতে একবার খবর নিয়ে ত্যাখ। হয়ত সে তার মা-বাপের কাছে চলে গেছে।

অবিনাশের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, তোমরা কি এইসব জিজ্ঞাসা করবার জন্যে ডাকলে আমাকে? নাও, গান শোন। আর যদি না শুনবে ত বল আমি যাই!

অবিনাশ সত্যিই চলে যাচ্ছিল। চন্দ্রমুখী তার পথ আগলে দাঁড়াল। বললে, গাও তুমি। নেচে নেচে গাও, আমরা শুনছি। অবিনাশ নাচলে, গাইলে।

গাইলে তার নিজেরই রচনা। অবিনাশ গানও বাঁধতে পারে। গাইলে—কলঙ্কী চাঁদ, তোমার সাদা গায়ে কালোর ছিটে কে লাগালে বল!

পাড়ার মেয়েরা আসে অবিনাশের কাছে। বলে, আমাদের ভাদুর গান লিখে দাও অবি-দা!

ভাদু আর কিছুই নয়, মাটির তৈরী একটা মেয়ে পুতুল।

প্রতিবেশী মেয়েরা দল বেঁধে এক একটি মাটির প্রতিমা গড়িয়ে এনে প্রায় মাসাবধিকাল রেখে দেয়। রোজ সন্ধ্যেবেলা মেয়েরা

সেখানে জড় হয়ে গান গায়। কিন্তু পুরো এক মাস ধরে গাইবার মত নতুন নতুন গান তারা পাবে কোথায়? কাজেই শরণ নিতে হয় অবিনাশের।

সুন্দরী ভাদু এনেছিল তিনবার। এই তিনবারে অবিনাশ অজস্র গান রচনা করে দিয়েছিল। গান আর সুর—দুইই।

সে-গান মেয়েরা এখনও গায়।

কিন্তু সে গানগুলো এবার বোধহয় পুরনো হয়ে গিয়েছে। তাই তারা এসেছে—অবিনাশকে দিয়ে নতুন গান লিখিয়ে নিতে।

অবিনাশ বসেছিল একটা কুলগাছের তলায়। বসে বসে হুঁকো টানছিল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে একবার।

নবোদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীর দল।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই? গান?

নাপিতদের মেয়ে টগর বললে, হ্যাঁ অবিদা, খুব ভাল ভাল —অবিনাশ ম্লান একটুখানি হাসলে। হেসেই আবার তামাক টানতে লাগল! সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরে ঘুরে উঠছে ওপরের দিকে। অবিনাশ কি যেন ভাবছে।

—কই লেখ। কাগজ পেন্সিল আন!

অবিনাশ তবু চুপ করে রইল। গান লিখতে সে ভালবাসে। অন্য সময় হলে এত অনুরোধ তাকে করতে হত না। কিন্তু আজ এই গানের কথায় সে যেন কয়েক বছর পিছিয়ে চলে গেল।

ভাদ্র মাস। আকাশের কালো মেঘ বর্ষার জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ঝাপসা নীল রঙের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। আর সেই চাঁদের ছায়া পড়েছে নদীর জলে। ভাদ্রের ভরা নদী। আষাঢ়ের বন্যায় সে ভয়ংকর দামোদর হয়।

অবিনাশ বসে ছিল একটা গাছের তলায়। কাছাকাছি কোথায় যেন কি ফুল ফুটেছে। নাম-না-জানা বুনো ফুলের

তীব্র একটা অচেনা সুগন্ধ আসছে হাওয়ায় ভেসে। দামোদর বয়ে চলেছে তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে। পাশ দিয়ে নয় —একেবারে গা ঘেঁসে। প্রতি বর্ষায় গ্রামটাকে সে ভাঙছে। কত লোকের কত বাড়ি এই নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কত লোক চলে গিয়েছে এই গ্রাম ছেড়ে। দূরের গ্রামে গিয়ে ঘর বেঁধেছে।

সুন্দরী তাকে প্রায় প্রতিদিনই বলেছে, চল আমরাও পালাই এখান থেকে।

অবিনাশের মন কিন্তু যেতে চায় না, এ গ্রাম ছেড়ে। বলে, নাই-বা গেলাম! বেশ ত আছি!

সুন্দরী বলে, তোমার খুব ভাগ্যি ভাল যে, এ বর্ষায় বাড়িটা তোমার গেল না। যখন যাবে, তখন ত যেতে হবে। অবিনাশ বলে, যেতে হয় তখন যাব, এখন কেন?

তার চেয়ে আকাশে কেমন চাঁদ উঠেছে ছাখ, কেমন ফুলের গন্ধ। বস এইখানে, বসে তোমার ভাদুর একটা গান শুনিয়ে দাও। সুন্দরী সত্যিই বসল তার গা ঘেঁসে। গানও সে গাইলে, তারই লেখা গান, তারই দেওয়া সুর।

ও ভাদরের নদী আমার ভাদুরাণীর সই।
এস তোমার কানে কানে দুটো মনের কথা কই!
ভাদুরাণীর সই!
তুমি ঘর ভেঙনা—
ভেঙনা মোর ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর।
কোথায় বল বসতে দেবে আসবে যখন বর।
আমার ভাদুরাণীর বর।
আমরা তোমার আপন জনা, পর আমরা নই
ও ভাদরের নদী আমার ভাদুরাণীর সই!

গান শেষ হলে সুন্দরী বললে, এস। নদীর ধারে বসে থাকে না। চল।

অবিনাশ বললে, অত ছুট-ফট করছ কেন? কেমন সুন্দর নদীর জল, দেখতে ইচ্ছে করছে না?

সুন্দরী বললে, হ্যাঁ, ভারি সুন্দর। ডুবে মরতে ইচ্ছে করছে।

সেই সুন্দরী যেদিন পালিয়ে গেল, অবিনাশের মনে হয়েছিল, সে বুঝি ডুবে মরেছে ওই নদীর জলে। কিন্তু না। ডুবে সে মরেনি। সে তাকে চিরদিনের জন্যে পরিত্যাগ করে পালিয়েই গিয়েছে।

গান লেখাতে এসে মেয়েগুলো আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? একজন আর একজনের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, না ভাই চল, গান অবিদা লিখবে না।

অবিনাশ মুখ তুলে আবার একবার তাকালে।

এই মেয়েগুলোও সেই সুন্দরীর জাত।

অবিনাশ বললে, হ্যাঁ, তোমরা যাও। গান আমি আর লিখতে পারব না।

মেয়েরা সত্যিই চলে গেল।

যাবার সময় বলে গেল, তা পারবে কেন? তুমি লিখতে তোমার বৌ-এর জন্যে। সে বৌ ত নেই।

সত্যিই তাই।

সংসারে অভাব ছিল না। তার ওপর ছিল তার পরমা সুন্দরী স্ত্রী। প্রাণদিয়ে তাকে সে ভালবেসেছিল। মনে ছিল আনন্দ। তাই যা কিছু সে করেছে, করেছে হয়ত বা সেই স্ত্রীর জন্যই।

সেই স্ত্রী, সেই বিশ্বাসঘাতিনী নারী তাকে পরিত্যাগ করে

চলে গিয়েছে। তাকে অপমান করেছে। তার ভালবাসার অপমান করেছে।

আবার বর্ষা নেমেছে।

গ্রামের লোকের এই বর্ষাকেই যা ভয়। তবে সব বর্ষাতেই যে নদীর পাড় ভাঙে, মানুষের ঘর দোর ভেসে যায়, তা নয়। নদীর যেখানে মুখ, সেই পশ্চিমের পাহাড়ী অঞ্চলে যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, নদীতে পাহাড়ী ঘোলাটে জলের যদি ঢল নামে, তাহলেই আশঙ্কা হয় হড়পা বানের।

সে বছর হড়পা বানের আশঙ্কা তখনও ছিল না, তবু গ্রামের লোক একটুখানি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

বৃষ্টির জোর খুব নেই। ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি নামে, কিছুক্ষণ পরে বন্ধ হয়; আবার নামে। এমনি করে যখন সারাটা দিন সারাটা রাত পার হয়ে গেল, পরের দিন যখন সূর্যের মুখ দেখা গেল না, তখন তাদের চঞ্চল হবার কথাই।

কিন্তু চঞ্চল হয়েই বা কি করবে? প্রতিকারের হাত তাদের নেই। পশ্চিমের সব দেশে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে ঐশ্বর্য দিয়ে বড় বড় দুরন্ত নদীতে বাঁধ বেঁধেছে। বাঁধ বেঁধে সর্বনাশা বন্যাকে প্রতিরোধ করেছে। আমাদের দেশ যেদিন বড় হবে, আমরাও হয়ত তাই করব।

অসহায় মানুষের এখন একমাত্র ভরসা দেবতা। তাই তারা দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়—হে ভগবান, বন্যা যেন না আসে! অতর্কিতে বন্যা এসে আমাদের যেন নিরাশ্রয় না করে দেয়! পশুপতি পালের ভয় যেন সবচেয়ে বেশি। তার বাড়িখানি একেবারে নদীর কিনারায়। তাই সে সকাল থেকে কাঁসার

একটি ছোট বাটি হাতে নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল পচু মোড়লের সন্ধানে। কারণ পচু তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান।

গ্রামে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে—মা-বাবার একমাত্র সন্তান যে হবে, সে যদি উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কাঁসার একটি বাটি মাটিতে পুঁতে দেয়, তাহলে বর্ষা নাকি বন্ধ হয়ে যায়।

অনেক কষ্টে, অনেক বলে-কয়ে পশুপতি পচুকে রাজি করাল। বাটি একটি পোঁতা হলো।

আশ্চর্য ব্যাপার! বাটি পোঁতার এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা পরই বৃষ্টি গেল বন্ধ হয়ে। আকাশের মেঘ গেল কেটে। আর দেখা গেল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় সূর্যদেব তখন অনেকখানি পথ এগিয়ে এসেছেন। গাছের মাথায় বৃষ্টি-ধোওয়া সবুজ চিকন পাতার ওপর সূর্যের আলো ঝিকমিক করতে লাগল।

আনন্দ যেন আর ধরে রাখতে পারছে না পশুপতি। অবিনাশের বাড়ি সে রোজই আসে একবার করে। সে দিনও এল। লোকে বলে, পশুপতি অত্যন্ত কৃপণ। পাছে খরচ হয়, তাই নিজের বাড়িতে সে তামাক খায় না। ছোট হুঁকোটি হাতে নিয়ে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়; যেখানে দেখে কেউ তামাক খাচ্ছে, সেইখানেই দাঁড়ায়; তার হুঁকো থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে নিজের হুঁকোর মাথায় বসিয়ে পড় পড় করে খুব জোরে জোরে বার-কতক টেনে নেয়।

হুঁকোটি হাতে নিয়ে দিনান্তে একবার সে অবিনাশের বাড়ি আসবেই। এসেই বলবে, কই হে অবিনাশ, তামাক খাচ্ছ নাকি ?

সেদিন এসে কিন্তু তামাকের কথাটা বললেই না। বললে, দেখছ অবিনাশ, বর্ষাবাদল কি রকম বন্ধ করে দিলাম। ওই দ্যাখ

কিরকম রোদ উঠল। বলেই সে তার উঠোনের কুলগাছটার মাথার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ছাখ।

অবিনাশ বললে, বৃষ্টি তুমিই বন্ধ করে দিলে?

পশুপতি বললে, হ্যাঁ, আমিই বন্ধ করে দিলাম। পচুকে দিয়ে বাটি পোঁতালাম।

বাটি পুঁতলে বৃষ্টি বন্ধ হয়, এমনি একটা জনপ্রবাদের কথা সেও জানে। কিন্তু বিশ্বাস করে না। অবিনাশের মনে হয়, নিরুপায় এবং অসহায় মানুষের কুসংস্কার ছাড়া এ আর কিছুই নয়। অবিনাশ পুতুল গড়বার জন্যে মাটি তৈরি করছিল, পশুপতির মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলে। হাসিটা অবিশ্বাসের হাসি।

পশুপতি বললে, তুমি বিশ্বাস করছ না অবিনাশ?

অবিনাশ ম্লান একটু হাসলে মাত্র! পশুপতির মনে সে আঘাত দিতে চায় না। বললে, তামাক খাও।

পশুপতি জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় তামাক?

অবিনাশ আঙুল বাড়িয়ে টিনের একটা কৌটো দেখিয়ে দিলে। বললে, ওই ত।

পশুপতি তামাক সাজতে বসল।

তামাক সাজতে সাজতে আপন মনেই বলতে লাগল, বর্ষাটা যে রকম জোর এসেছিল এ বছর, আমার সত্যিই ভয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর কিছু হবে না। কি বল অবিনাশ?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ।

তামাক সেজে, টিকেয় আগুন ধরিয়ে পশুপতি এগিয়ে এসে বসল অবিনাশের কাছে। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, বৌ-এর খোঁজ খবর কিছু পেলে?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে, না।

—এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে খোঁজ খবর একটু করবে না ?

—না।

পশুপতি বললে, সেই ভাল। যে চলে গেছে, সে যাকগে। তুমি আর একটা বিয়ে কর।

অবিনাশ একটু হাসলে। হেসে উঠে দাঁড়াল।

এ প্রসঙ্গ আর ভাল লাগছে না।

পশুপতি বললে, উঠলে যে ?

অবিনাশ সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চায়। বললে, কাজ আছে। এই বলে সত্যিই সে চলে যাচ্ছিল।

পশুপতি বললে, তামাক খাবে না ?

অবিনাশ বললে, না।

পশুপতি বললে, তাহলে আমিও যাই।

—হ্যাঁ, যাও।

পশুপতি চলে গেল গাঁয়ের পথে, আর অবিনাশ গেল নদীর ঘাটে। ঘাটে সেদিন খেয়া চলছে। রামদেও পারিয়া জমায় বন্দোবস্ত নিয়েছে এই খেয়া-ঘাটের।

প্রকাণ্ড শিমুলগাছের তলায় তার নৌকো এসে লাগল। ওপারের শহর থেকে একটা টিন-বোঝাই নৌকো এল।

লোকজনের আনাগোনায় নদীর কিনারে সরু এক ফালি পায়ে চলা দাগ পড়েছে। সেই সঙ্কীর্ণ পথরেখা এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে হট্‌কি গ্রামের ভিতর দিয়ে। গিয়ে মিশেছে বাঁক্‌ড়ো যাবার পাকা সড়কে। অনেকগুলো ধানের মাঠ আর পলাশের একটা বড় জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয় সেখানে। সে অনেক দূরের পথ।

এই পথ দিয়ে সুন্দরী চলে গিয়েছে কিনা তাই-বা কে বলবে ?

একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছ। এই গাছটাই নিশানা। অশ্বত্থের গুঁড়ি পর্যন্ত নদীর জল যদি ওঠে, তাহলে আর

নিস্তার নেই। হড়পা বান আসবেই। আর হড়পা বান এলেই হট্‌কি গ্রামের সর্বনাশ।

নদীর জল এবছরও বেড়েছে মন্দ নয়। অশ্বত্থগাছের বড় বড় শিকড় পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে। অবিনাশ সেই অশ্বত্থগাছের উঁচু একটা শিকড়ের উপর গিয়ে বসল। পাশেই শ্মশান।

কত মানুষ এই শ্মশানে পুড়েছে তার অন্ত নেই। অবিনাশ নিজে পুড়িয়ে গিয়েছে অনেককে। নদীর চরে নিভন্ত চিতার কালো কালো দাগ দেখা যায়। কত পোড়া কাঠ, কত কয়লা, কত খাট, কত বালিশ ছড়িয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এখন আর সে-সবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নদীর ঘোলা জল এসে সেগুলো ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। বিষ্ণু দাস, জগৎ বৈরাগী, রাধু কামার —তিনজনেই মরেছে গত শীতের সময়। নদীতে তখন জল ছিল না। শুকনো বালি ধু ধু করত। হরিদাসের ছোট বোনটা ত সেদিন গেল। বর্ষার ঠিক আগেই। মেয়েটার মরা মুখখানি এখনও মনে পড়ে! একপিঠ চুল, পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর। আগুনে আর গায়ের রঙে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সে নিজের চোখে দেখেছে। এইত রূপ! এই রূপের বড়াই করে মেয়েরা।

সুন্দরীও করত।

কিন্তু এ-ঘাটে যারা পার হয় তাদের বোধকরি আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুন্দরী কিন্তু এই অশ্বত্থতলার শ্মশান-ঘাটে পার হয়নি। পেরুলে বোধহয় ভালই করত। অবিনাশের মনে একটা সান্ত্বনা থাকত।

অবিনাশের মনে পড়ল, সুন্দরীর আর-এক নাম তুলসী।

সুন্দরী বলত, বলি ওগো সন্নেসী-ঠাকুর, তোমার ওই গেরুয়া রঙের আলখাল্লাটা তুমি ছাড়।

অবিনাশ বলত, আলখাল্লা ত ছাড়বই না। এবার থেকে তুলসীর মালা পরব গলায়।

সুন্দরীর সে কি রাগ!

রাগের হাসি হেসে সুন্দরী বলত, থাক, পায়ে রেখেছ সেই ভাল, আবার গলায় কেন?

অবিনাশ তাকে আরও রাগাবার চেষ্টা করত। রসিকতা করে গান ধরত!

পায়ে নয় মাথায় রাধে
শ্যাম তোরে মাথায় রেখেছে।
পায়ের ঘুঙুর হাতের বাঁশী
কেঁদে কেঁদে তোরেই ডেকেছে।
রাধে, তোরেই সেধেছে।

উনোনে হয়ত ভাত চড়িয়েছে সুন্দরী! হাসতে হাসতে পেছন ফিরে গিয়ে বসত সেইখানে। বসে বসে হাসত, কাঠি দিয়ে ভাত নাড়ত আর হাসত।

হাসি তার কিছুতেই বন্ধ হত না।

পেছন ফিরে বসলেও অবিনাশ টের পেত!

সুন্দরী তার ভাতের কাঠি জোরে জোরে নাড়ত, চুড়ির ঠিন্ ঠিন্ আওয়াজ হত, পাতলা শাড়ির নীচে খোঁপায় গোঁজা সোণার প্রজাপতি ঝিক্‌মিক্ করে উঠত। চুরি-করা হাসির ধমকে তার আপাদমস্তক যেন থর থর করে কাঁপত।

সে সব দিনের কথা আর নয়।

সব কিছু চুকে গেছে। সুন্দরী নিজেই চুকিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ কার যেন ডাক শোনা গেল।—কে ওখানে? অবিনাশ মুখ তুলে তাকাতেই দেখে—শিমুলতলার খেয়া-ঘাটে নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে রামদেও হুঁকো টানছে।

রামদেও হাঁকলে, চুলওলা মিস্ত্রি !

অবিনাশ বললে, ডাকছ আমাকে ?

রামদেও বললে, হ্যাঁ ভাই, ডাকছি।

অবিনাশ উঠে গেল শিমুলতলায়।

রামদেও বললে, বাপ-চোদ্দ-পুরুষের কাজ, তাই ছাড়তে পারছি না, নইলে এই খেয়ানৌকোর কাজ ছেড়ে দিতাম ভাই।

অবিনাশ হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কেন ? এত রাগ কিসের ?

রাগটা নৌকোর ওপর। নৌকোর মাথার দিকে একটা ফুটো বেরিয়েছে। পেরেক পাটাতন না করলেই নয় !

অবিনাশ দেখলে। দেখলে, ফুটো সামান্যই। জোড়ের মুখে ফাট ধরেছে একটুখানি। পাটাতন বদলাতে হবে না। পেরেক ঠুকে দিলেই চলবে। হাতুড়ি পেরেক নৌকোতেই ছিল। ঘা-কতক ঠুকে গোটাকতক পেরেক বসিয়ে দিয়ে অবিনাশ বললে, বাস, হয়ে গেছে। রামদেও ঘুরে ফিরে ফুটোর মুখে চোখ রেখে দেখলে। দেখে নিশ্চিন্ত হল। অবিনাশকে বললে, বোসো, তামাক খাও।

অবিনাশ বসল ভাল করে চেপে।

রামদেও বলতে লাগল তার দুঃখের কথা। বললে, এ বছর শুধু লোকসান আর লোকসান ! আবার খেয়া পারাপার কতদিন বন্ধ থাকবে কে জানে !

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, কেন ? এই তো বেশ রোদ উঠেছে। বৃষ্টি বাদল বন্ধ হয়ে গেছে—

রামদেও বললে, হোক। আমরা জল দেখে বুঝতে পারি। নদীতে সাদা সাদা ফেনা ভেসে আসছে। হড়পা বান আসবেই। তুমি দেখে নিও অবিনাশ।

অবিনাশ বললে, কখন আসবে মনে হচ্ছে ?

রামদেও বললে, সঠিক বলতে পারছি না ভাই। আজ হোক কাল হোক, আসবেই।

এই বলে রামদেও তার কলকেটা অবিনাশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, আজ আর তুমি তোমার ওই ঘরে থেকো না অবিনাশ।

অবিনাশ বললে, কেন ?

রামদেও বললে, বানকে বিশ্বাস করতে আছে ? হড়পা বানের জল তোমার ঘর পর্যন্ত উঠতে পারে।

নিতান্ত উদাসীনের মত অবিনাশ বললে, উঠুক।

বলেই সে একবার নদীর দিকে তাকাল। নদীর কানায় কানায় জল।

—ওইটা ঘূর্ণী, না ?

রামদেও বললে, ঘুরন্-চাকি এ-বছর যেখানে সেখানে।

ঘুরন্-চাকির অভাব নেই। এই ঘুরন্—ওই ঘুরন্—ওই তো আর একটা—আর এই দেখ বড় ঘুরন্। ওই ঘুরনেই সেবার আমার বড় নৌকোটা ডুবেছে।

নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে রামদেও আঙুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছিল। অসম্ভব জলের তোড়। পশ্চিম থেকে ক্রমাগত ছুটে আসছে ঘোলা জল—ঘূর্ণীতে পড়ে চাকার মত ঘুরপাক খাচ্ছে—আবার ছুটছে সুমুখের দিকে।

অবিনাশ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলে।

দেখলে, পশ্চিমে শুধু জল—আর জল—আকাশের সেই শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। দূরে মাত্র আবছা কয়েকটা গাছপালা দেখা যাচ্ছে, আর একটা সাদা দালান-বাড়ির খানিকটা। নদীটা ওই খানে একটু বেঁকেছে। এই বাঁকের মুখে কয়লা-কুঠির এক সাহেব বাড়ি তৈরী করেছে। ওই সেই সাহেবের বাড়ি।

খোঁড়া মাকিনটোশ সায়েবের বাড়ি—না ?

রামদেও বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, খোঁড়া মিকিনজি সায়েবের বহুত পয়সা।

অবিনাশ জানে। রাণীগঞ্জ শহরে গিয়ে অবিনাশ একদিন দেখেও এসেছে সাহেবকে। খাঁটি মেহগিনি কাঠের তৈরী ক্রাচ দুটো বগলে চেপে ধরে সাহেব খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। হাঁটতে অবশ্য তাকে খুব কমই হয়।

সাহেবের মোটর-কার আছে। চকচকে লাল রঙের মস্তবড় মোটর গাড়ি। অবিনাশ যেদিন শহরে গিয়েছিল, সাহেবের গাড়ি তখন বেরুচ্ছিল বাংলো ছেড়ে। ফটকের একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল অবিনাশ। সাহেবের ড্রাইভার চালাচ্ছিল গাড়ি। সাহেব বসেছিল গাড়ির পেছনে। সাহেবের পাশে বসেছিল মেম-সাহেব।

অবিনাশ শুনেছিল লোকের মুখে—সাহেব নাকি সাঁওতালদের একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু সেদিন সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে—কথাটা সত্যি। সাহেবের গায়ের রঙ ধব-ধবে সাদা। আর মেম-সাহেব কুচকুচে কালো। সুন্দরীর মত সেও যদি একদিন সাহেবকে ছেড়ে পালিয়ে যায়? না না, পৃথিবীর সব মেয়েই সুন্দরীর মত নয়।

* * *

রাত্রি তখন কত—পাড়াগাঁয়ের মানুষ—কেই বা খবর রাখে? আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

নিজের হাতে রান্না করতে সবদিন ভাল লাগে না! রাত্রে চারটি মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিল অবিনাশ। অন্ধকার ঘরের ভেতর একাকী শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে শুধু সুন্দরীর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মেঘগর্জনের প্রচণ্ড শব্দ। না, মেঘ গর্জনের শব্দ তো এতক্ষণ থাকে না!

অবিনাশ কান পেতে রইল। মনে পড়ল একটা কথা।

রামদেও বলেছিল, হড়পা বান আসতে পারে।

অবিনাশ ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

অন্ধকার!

রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখা যায় না। সব যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু চোখে দেখা না গেলেও কানে শোনা যায়। মেঘগর্জনের শব্দটা যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। বানের শব্দ। সে যে কি প্রচণ্ড! কি মারাত্মক! যে লোক নিজের চোখে না দেখেছে সে বুঝবে না। সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার কথা অবিনাশের মনে হল একবার। কিন্তু গেল না। চালার খুঁটি ধরে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে।

সে মরবে। তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাক দুর্দ্ধর্ষ বন্যা!

চোখের স্থমুখে আসন্ন মৃত্যু। জলের ভেতরে মানুষ কেমন করে মরে তাই সে কল্পনা করতে লাগল। কত জন বাঁচবার জন্যে কত চেষ্টা করে। অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করে—তারপর হঠাৎ একসময় প্রাণটা বেরিয়ে যায়।

অবিনাশ ছুটে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল।

উঠোনের একপাশে বাঁশের খুঁটি দেওয়া একটি চালাঘরে ঢেঁকি পোঁতা ছিল। অবিনাশ তাড়াতাড়ি সেইখানে গিয়ে উঠল।

আলোর চিহ্নমাত্র নেই। অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে! আকাশে তারাগুলো ডুবে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

আবার বুঝি বিদ্যুৎ চমকাল।

দেওয়ালের একপাশে ঢেঁকিটা পোঁতা ছিল। এই ঢেঁকির মাথায় দাঁড়িয়ে স্থন্দরী পাড় দিত। একটি পা থাকত ঢেঁকির মাথায়,

আর এক-পা থাকত মাটিতে। ওপরে ঐ বাঁশের ধরনীতে হাত রেখে সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে তার নাচন্ শুরু করত। তালে তালে ঢেঁকির শব্দ উঠত।

অবিনাশ বলত, ঢেঁকি তৈরী এতদিনে আমার সার্থক হলো।

সুন্দরী বলত, হ্যাঁ, আমাকে নাকেদমে খাটিয়ে নিয়ে! কোমর কাঁকাল ধরে গেল।

অবিনাশ বলত, না বাপু, তুমি সব কিছু উল্টো বোঝো।

সুন্দরী বলত, আমি তো তোমার মত সোজা নই!

বন্যার শব্দ আর যেন অবিনাশের কানে ঢুকছে না। সুন্দরীর চিন্তায় সে তখন তন্ময় হয়ে গেছে।

মনে হল, অন্ধকারে চোখের সুমুখে এখনও যেন সে ওই ঢেঁকির মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। আলতা-পরা সুন্দর একখানি পা রয়েছে ঢেঁকির মাথায়—আর এক পা রয়েছে মাটিতে। পায়ের কাপড় হাঁটু-অবধি উঠে গেছে! চমৎকার নিটোল তুখানি পা যেন তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠল।

সুন্দর সুস্পষ্ট সুন্দরীর সম্পূর্ণ অবয়ব সে যেন দেখতে পেলে তার চোখের সামনে।

তাবপর?

তারপর কি হলো কে জানে!

*　　　*　　　*

বন্যার জল তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে।

কোথায় এনেছে কিছুই সে জানে না। শুধু মনে আছে হিম-শীতল জলের একটা প্রচণ্ড ঝাপটা তাকে যেন আলিঙ্গন করে জাপটে ধরে কোথায় যেন তলিয়ে নিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে—সে বোধহয় আর বেঁচে নেই।

ভীষণ দামোদরের তুফানের তলায় নিজে সে কতটুকুই-বা! একটা বান-ভাসি সে স্বচক্ষে দেখেছে। আজও সে স্মৃতি তার মন থেকে মোছেনি।

হড়পা বান এসেছিল দিনের বেলায়। লোকজন আগে থেকে সাবধান হয়েছিল। অনেক দূরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সকলে।

নিজে সে দেখেছে—দূরের গ্রাম থেকে ভেসে আসছে কত জানোয়ার, কত গরু, কত ছাগল, কত ভেড়া। বাঁচবার জন্যে সে কি প্রচণ্ড প্রয়াস তাদের! সে কি নিদারুণ উদ্বেগের কালো ছায়া! কথা বলতে পারে না—নিরুপায় জীবগুলি শুধু ছট-ফট করে, ডোবে আর ওঠে—তারপর হঠাৎ একসময় হাত-পা এলিয়ে দেয়। অচেতন হয়ে চলে অজানা নিরুদ্দেশে।

কত মানুষের মৃতদেহ তাদের ঘাটে এসে লেগেছে। বড় বড় কাঠ, কত পাথর, কত গাছ, কত ঘর-বাড়ি গড়াতে গড়াতে ভেসে চলেছে। কত গ্রাম, কত শহর……!

অবিনাশ ভেসে চলেছে। অন্ধকারে কিছুই সে বুঝতে পারছে না। তবু তার মনে হচ্ছে সে একা নয়। হটকির কত মানুষ, কত গরু-ছাগল ভেসে এসেছে তাই-বা কে বলতে পারে।

আস্ত একটা খড়ো-ঘরের চালার ওপর শুয়ে আছে অবিনাশ। শালের একটা খুঁটি প্রাণপণে চেপে ধরে সে থর থর করে কাঁপছে। সর্বশরীর ভিজে গেছে। কোমরের কাপড়টা কোনরকমে জড়ানো আছে মাত্র। খালি গা। মাথায় একমাথা চুল ভিজে জ্যাব জ্যাব করছে।

প্রাণে বেঁচে আছে এই যথেষ্ট।

অবিনাশ ভেবেছিল মরবে। নইলে হয়ত সে ছুটে পালিয়ে যেতে পারত। রামদেও মাঝির কথায় বিশ্বাস করে আজ তার নিজের ঘরে না থাকলেও চলত।

কিন্তু এখন ?

মৃত্যুর অভিজ্ঞতা তার হয়ে গেছে।

এখন মনে হচ্ছে কতক্ষণে সকাল হয়। কতক্ষণে প্রাণে বেঁচে সে শুকনো জমিতে উঠতে পারে।

রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটেনি। চারদিকে অথই জল শুধু থইথই করছে। মাথার ওপর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। বানের প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। জল চলেছে তীরের মত।

অবিনাশের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। এখনও বিশ্বাস নেই। এখনও হয়ত এই সর্বনাশা নদী তাকে মৃত্যুর কোন্ অজানা অবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। যে জিনিসটার ওপর সে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে—সেটা থর থর করে কাঁপছে। সেটা যে কি বস্তু এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না অবিনাশ।

কোথায় চলেছে কে জানে।

একবার যদি কোনরকমে সে আশ্রয়হীন হয়, দামোদরের বুকের তলায় কোথায় সে তলিয়ে যাবে—গড়াতে গড়াতে তার মৃতদেহ যে কোথায় কোন্ ঘাটে গিয়ে লাগবে—তাই বা কে বলতে পারে।

মৃত্যু সে চেয়েছিল। হ্যাঁ, নিশ্চয় চেয়েছিল। চেয়েছিল জীবনের সব কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে মরণের কোলে একটুখানি বিশ্রাম। চেয়েছিল, জীবনের সকল দুঃখ, সকল জ্বালা ভুলে গিয়ে অনন্ত শান্তি। কিন্তু এত অশান্ত এত ভয়ঙ্কর যে মরণের রূপ তা কি সে আগে জেনেছিল ? পৃথিবীর ওপর এত মমতা মানুষের !

অবিনাশ তার হাতের খুঁটিটা দু হাত দিয়ে প্রাণপণে চেপে ধরলে।

আবার একবার বিদ্যুৎ চমকালো।

আকাশ আর জল সব যেন একাকার হয়ে গেছে। কিছুদূর গিয়ে মনে হলো যেন খড়ের যে চালাটার ওপর সে শুয়েছিল সেটা আর চলছে না। কোথায় যেন 'আটকে গেছে। চালাটাও কাঁপছে, অবিনাশও কাঁপছে। কোথায় কিসে আটকে গেল কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

অবিনাশ হামাগুড়ি দিয়ে একটুখানি উঠে মাথা তুলে চেয়ে দেখলে।

সূচিভেদ্য অন্ধকার। কিছুই ভাল দেখা যায় না। তবে কি সে মরে গেল নাকি ?

অবিনাশ একটা হাত তার নিজের বুকের উপর রাখলে। দেখলে, না, ধিক ধিক করে চলেছে ঠিক ঘড়ির মত। মরেনি তাহলে, বেঁচেই আছে।

কিন্তু এই অস্বস্তিকর অন্ধকার কি কাটবে না ?

উর্দ্ধে আকাশের পানে অবিনাশ একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। একটা বিদ্যুতও চমকায় না। সব বিদ্যুৎ যেন ফুরিয়ে গেছে।

চারিদিক থমথম করছে।

হঠাৎ কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ তার কানে এল। চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ।

সুন্দরী এলো নাকি ?

অবিনাশ চীৎকার করে উঠল, কে ?

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই সে চমকে উঠলো।

ছি ছি, একি সর্বনাশা মতিভ্রম তার !

যে মেয়ে তাকে অপমান করে চলে গেছে, এখানে এই মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে তারই কথা ভাবছে !

কতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল কে জানে !

হঠাৎ মনে হলো যেন দূরে আকাশের খানিকটা রাঙা হয়ে উঠছে। ওই বুঝি সূর্য উঠল। আশায় আনন্দে অবিনাশ সাগ্রহে সেই রক্তিম আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কিন্তু না, প্রহরের পর প্রহর যায়—সূর্য আর ওঠে না! তবে কি মিলুটির কারখানার আগুন?

ঠিক তাই।

হটকির হাটতলা থেকে কতদিন তারা ওই আগুনের ছটা দেখেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মিলুটির ইস্পাতের কারখানায় ফরনেশের আগুন।

কিন্তু রাত্রি তো অনন্ত কাল থাকে না!

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান বুঝি হলো বুঝি এতক্ষণে!

পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মনে হলো যেন এতক্ষণ পরে সত্যিই প্রভাত হলো। রাত্রির অন্ধকার নিঃশব্দ-চরণে সরে যাচ্ছে। দিগন্তরাল থেকে অস্পষ্ট আলোর রেখা ধীরে ধীরে যেন ছড়িয়ে পড়ছে আকাশের গায়ে।

দেখতে দেখতে চারিদিক স্পষ্ট হয়ে এলো। পাথর দিয়ে বাঁধানো নদীর উঁচু একটা পাড়ের কিনারায় প্রকাণ্ড একটা লোহার যন্ত্র বসানো। আর সেই যন্ত্রের গা বেয়ে লোহার কয়েকটা মোটা মোটা পাইপ নদীর ভেতর পর্যন্ত চলে এসেছে। সেই পাইপের গায়ে এসে লেগেছে খড়ো একটা বাড়ির আস্ত চালা। আর সেই চালার ওপর সে নিজে।

দূরে কয়েকটা গাছের আড়ালে চিমনির মাথা দেখা যায়।

অবিনাশ এতক্ষণে বুঝতে পারলে—মিহিরপুরের কাগজের কল এটা। ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে পাইপটাকে ধরে সে তার ভাসমান আশ্রয়টিকে দিলে ছেড়ে। ভেবেছিল, পাইপটাকে ধরে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে উঠতে হবে পাথর দিয়ে বাঁধানো নদীর পাড়ে।

কিন্তু জলে পা দিতেই বুঝতে পারলে, জলের নীচে পাশাপাশি আরও অনেকগুলো পাইপ শক্ত করে গাঁথা। তারই উপর হেঁটে হেঁটে অতি সহজেই উঠে গেল বাঁধের ওপর।

এবার সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

নদীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে। গর্জমান বিক্ষুব্ধ নদীর সে উচ্ছলিত ভীষণ স্রোতের দিকে তাকাতে ভয় করে। এরই ওপর দিয়ে কি উদ্বেগে সে যে কেমন করে সারারাত্রি ভেসে এসেছে, কেমন করে খড়ের চালাটা ধরেছে, আর কেমন করেই বা সেটা এই কাগজ-কলের ঘাটে এসে লেগেছে কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সবই যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হলো। হঠাৎ তার নজর পড়লো পরিত্যক্ত সেই আশ্রয়টির দিকে। নজর পড়তেই চমকে উঠল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলে, চালার যে-জায়গাটা আঁকড়ে ধরে সে সারারাত জলের ওপর ভেসে এসেছে, তারই কিছু দূরে নির্জীবের মত উপুড় হয়ে পড়ে আছে সুন্দরী একটি মেয়ে। হাতে সোনার চুড়ি, পায়ে আলতা, ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে বলেই মনে হয়।

চুড়ির শব্দ তা হলে সে ঠিকই শুনেছে।

আশ্চর্য!

একই সঙ্গে পাশাপাশি ভেসে এলো তারা দু'জনে!

অবিনাশ চলে যাচ্ছিল। আবার কি ভেবে ফিরে দাঁড়াল।

তুলে আনবে নাকি মেয়েটিকে?

কিন্তু ওরকম ভাবে শুয়ে আছে মুখ ফিরিয়ে, মেয়েটি কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

না। এই বিপদের মাঝে—আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ ঘুমোতে পারে না কখনও। তবে কি মরে গেছে?

অবিনাশ আবার সেইখানে নেমে গেল। মেয়েটির পাশে গিয়ে ঝুঁকে দেখলে, না, মরেনি। চোখ বুজে শুয়ে আছে।

আর যেন সে হাতে পায়ে জোর পাচ্ছিল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে। স্রোতের ধাক্কায় চালাটা আবার কাঁপতে লাগল। কি জানি হয়ত আবার সেটা ভেসে যাবে।

অবিনাশ ধীরে-ধীরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির প্রসারিত হাতের ওপর একটুখানি চাপ দিলে। হাতখানি ধরে তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করলে। মুখে কিছু বলতে পারলে না।

মেয়েটি এতক্ষণ পরে আচম্‌কা মুখ তুলে তাকালে। কারও কিছু বলবার প্রয়োজন হলো না। অনেক কষ্টে ধরাধরি করে অবিনাশ তাকে টেনে তুললে।

পাড়ে এসেও মেয়েটি কিন্তু কথা বললে না।

অসংবৃত গাত্রাবরণ সামলে নিয়ে চুপ করে হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় বাড়ি তোমার ?

মেয়েটি আড়চোখে তাকালে অবিনাশের মুখের দিকে।

তারপর একটুখানি হেসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কথাটার জবাব দিলে না।

এ-হাসি অবিনাশের ভাল লাগলো না। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে এই মাত্র যে ছাড়া পেয়েছে, মরতে গিয়ে যে বেঁচে গেছে, তার মুখে নির্লজ্জের মত এই হাসি দেখে অবিনাশের সর্বাঙ্গ যেন রি রি করে উঠল।

অবিনাশ আবার জিজ্ঞাসা করলে, বল না কোথায় বাড়ি তোমার ? কাদের মেয়ে ? কি নাম ?

মেয়েটি তবু নিরুত্তর। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

এ আবার কেমনতর লজ্জা!

অনেক চেষ্টা করেও অবিনাশ তাকে কথা বলাতে পারলে না। ভাবলে, মেয়েটা বুঝি বোবা।

তা হোক।

তবে এসো আমার সঙ্গে!

অবিনাশ এগিয়ে চলল।

মেয়েটি তার পিছু-পিছু গেল।

* * *

সুদখোর এক বুড়োর কথা বলি।

বুড়োর একটা পা কাটা। কাঠের দুটো ঠেঙ্গো নিয়ে ঠক্ ঠক্ করে পথ চলে, আর পথের দু পাশে যাকেই দেখতে পায় তাকেই গালাগালি দেয়।

তার এই কাটা পায়ের একটা ইতিহাস আছে। বুড়ো হাসে আর বলে, এমনি ঠেঙ্গোধারী আমাদের এই মিহিরপুরেই ছিল তিনটি। ভিটে মাটি বেচে দিয়ে সব পালিয়ে গেল এখান থেকে।

বুড়োর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়নি সেরকম মানুষ সারা মিহিরপুর খুঁজলে একজনও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

হাটতলায় সেদিন পানের গাঁট নেমেছে।

পানের ব্যবসা যারা করে সবাই এসে জুটেছে।

বুড়ো ঠেঙ্গো ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

সবাই বললে, এস কর্তা এস। বোস।

বসি। বলেই সে তার ঠেঙ্গো দুটি নামিয়ে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সর ওপর চেপে বসলো।

বিনা প্রয়োজনে বসলো না। হারুর সঙ্গে তার প্রয়োজন ছিল।

হারু পানের ব্যবসা করে। পানের দুটো গাঁট দুজন লোকের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে হারু বললে, যা তোরা সোজা চলে যা আমার দোকানে। বলবি, আমি গয়ারামের সঙ্গে কথা বলেই যাচ্ছি।

পা-কাটা বুড়োর নাম গয়ারাম।

হারু গয়ারামের হাতের কাছে একগোছা পান নামিয়ে দিয়ে বললে, টাকা আজ আর দিতে পারলাম না কর্তা। টাকা দেবো আসছে হপ্তায়।

গয়ারাম বললে, আসছে হপ্তায় আমি এখানে থাকব না হারু।

থাকবে না তো যাবে কোথায় ?

গয়ারাম বললে, শ্বশুরবাড়ি। সম্পত্তি পেয়েছি শ্বশুরের। রাজকন্যে তো পেয়েছিই, এইবার রাজত্বি পেলাম।

বুড়োর মুখে হাসি যেন আর ধরে না! হাসে আর বলে, শ্বশুরের সম্পত্তি খাবে কে ? শালা একটি ছিল, তাও তো পটল তুললে—

ঠিক কবে তুই টাকা দিবি বল !

হারু বললে, আসছে হপ্তায়।

গয়ারাম বলে, আসছে হপ্তায় কবে ? কোন তারিখে—বল্। কখন—কোন্ সময়ে আসব বলে দে বাবা, বুড়োমানুষ, খোঁড়া মানুষ, এসে যদি ফিরে যেতে হয় ভারি কষ্ট হবে।

হারু বলে, আরও কিছু টাকা তোমায় দিতে হবে কত্তা। ভাইটা এসেছে দেশ থেকে। তাকেও একটা দোকান করে দেবো ভাবছি।

গয়ারাম বলে, না বাবা, এখানকার সম্পর্ক সব চুকিয়ে দিয়ে যাব। টাকা আর আমি কাউকে দেবো না।

হারু ছাড়বার ছেলে নয়। বলে, কি যে বল কত্তা।

হাসালে তুমি। তোমার কাছে টাকা চাইলে টাকা পাব না—একি কখনও হয়! টাকা তোমার মরবে না—ডুববে না। তোমার টাকা আমি পৌঁছে দিয়ে আসব—তা সে তুমি যেখানেই যাও। কাশীই যাও আর মক্কাই যাও।

গয়ারাম বলে, টাকার সুদ কত দিবি?

হারু বলে, যা দিই।

গয়ারাম বলে, না। এবারে আমি টাকায় তিন পয়সা নেবো।

—তাই দেবো। দাও পায়ের ধুলো দাও।

হারু হাত বাড়িয়ে তার একটি পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

বুড়ো বললে, বেশ তবে যাস আমার বাড়িতে। গিন্নিকে একবার জিজ্ঞাসা করব, কবে টাকা দেবো। একটি চার পয়সার টিকিট কিনে নিয়ে যাস। আজ উঠি। টিকে-মহল্লায় পঁচিশ টাকা এখনও আদায় হয়নি।

বুড়ো উঠলো।

বড় সাহেবের বাংলোর কাছাকাছি যেতেই দেখা হলো অবিনাশের সঙ্গে। অবিনাশ আর সেই মেয়েটি।

—কোথাকার মানুষ হে তুমি?

অবিনাশ প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে। বললে, আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি।

অবিনাশ বললে, বানে ভেসে এসেছি। এই দেশেই বাড়ি।

—কি চাও?

—একটুখানি আশ্রয়। দেবেন?

—কেন দেব না?—গয়ারাম বললে, নিশ্চয় দেবো। কত ভাড়া দিতে পারবে?

অবিনাশ বললে, আপাততঃ কিছুই দিতে পারব না। পরে রোজগার হয় যদি, তখন দেবো।

গয়ারাম জিজ্ঞাসা করলে, কত দেবে ?

অবিনাশ বললে, বেশ তো মানুষ আপনি ! কেমন বাড়ি—কেমন ঘর—কিছুই দেখলাম না, আগেই জিজ্ঞাসা করছেন, কত দেবে ?

কথাটা সত্যি ! গয়ারাম একটু লজ্জিত হলো। গাছের তলায় অবিনাশ যেখানে বসেছিল, সেইখানেই বসলো তার ঠেঙ্গো ছুটি নামিয়ে, বললে, ঠিক কথাই বলেছ তুমি। তবে তোমাকেও আমার কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করা দরকার। বাড়িতে বাস করবে, শুধু নাম-ধাম বললেই তো হবে না। আরও কয়েকটা কথার জবাব দিতে হবে।

—কি কথা বলুন।

গয়ারাম এইবার মেয়েটির দিকে তাকালে। এক মুহূর্ত্ত। তারপরেই মাথাটি কাৎ করে বললে, হ্যাঁ—সেবাদাসী।

—বিয়ে-করা না এমনিই ?

—এমনিই।

গয়ারাম বললে, পুলিশের হাঙ্গামা-টাঙ্গামা হবে না তো ?

অবিনাশ বললে, আজ্ঞে না, সে সব ভয় আপনার নেই।

—বেশ, বেশ।

গয়ারামের জিজ্ঞাসা করবার মত আর কিছু নেই। শ্বশুর-বাড়ির সম্পত্তি দখল করতে যদি যেতেই হয় তো এইরকম একজন লোক তার বাড়িতে রেখে যেতে হবে। সেই সন্ধানেই আজ সে বেরিয়েছে। কিন্তু লোকটা বলছে, টাকাকড়ি কিছু দিতে পারবে না। গয়ারাম ভাবলে, মানুষ প্রথমে ওরকম বলে। টাকাকড়ি সহজে কেই-বা দিতে চায়।

গয়ারামের উঠতে ইচ্ছে করছিল না। মেয়েটি বেশ। তার দিকে ঘন ঘন তাকাতে তাকাতে বললে, বিড়ি খাবে ?

বলেই সে তার ফতুয়ার পকেট থেকে দুটি বিড়ি আর দেশলাই বের করলে। একটি নিজে রেখে আর একটি অবিনাশের হাতের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, কই আমার কথা তুমি তো কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না ?

অবিনাশ বললে, আপনার কথা—কি জিজ্ঞাসা করব ? আপনি আমাকে দয়া করে আপনার বাড়িতে থাকতে দেবেন, ব্যস আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার তো নেই।

—নেই ? তুমি কি এক্ষুনি যাবে আমার সঙ্গে ?

—আজ্ঞে না। সাহেব আমাকে একটি কাজ দেবে বলেছে। তাই এইখানে বসে আছি। সাহেবের সঙ্গে কথা-বার্তা হোক, তারপর যাব।

—তখন কোথায় পাবে আমাকে ?

অবিনাশ বললে, বলুন, কোথায় পাব ?

গয়ারাম হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, দেখ, তোমার কেমন ভুল দেখ। আমার নাম জানলে না, ঠিকানা জানলে না, তুমি আমাকে খুঁজে বের করবে কেমন করে ?

অবিনাশও হাসলে। বললে, আপনাকে খুঁজে বের করা শক্ত কিছু নয়।

গয়ারাম আবার হেসে উঠলো। বললে, বুঝতে পেরেছি। বলবে, হাতে দুটো ঠেঙ্গো নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, পা-কাটা সেই লোকটার বাড়ি কোথায় বলতে পার ? কেমন ? এই তো ?

অবিনাশ বিড়িতে একটা টান দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

গয়ারাম এতক্ষণ পরে একটা কথা বলবার মত বিষয় পেলে। তার এই কাটা পায়ের ইতিহাস। বললে, পা'টা কাটা পড়লো কেন জান ?

কাগজ-কলের কয়েকটা চিমনির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই কলের জন্যে। কাগজের কল—তা এখানে কেন বাপু ?

—ছেলেপুলেরা লিখবে কাগজের ওপর চর চর করে ? হ্যাঁ, লিখছে তো খুব !

অবিনাশ বললে, না না, ও কথা বলবেন না। কাগজের কত দরকার ! কাগজ না হলে বই ছাপা হতো না, খবরের কাগজ ছাপা হতো না। ··

আরও কি সে বলতে যাচ্ছিল। গয়ারাম বললে, বই মানে পাঁজি—পঞ্জিকার কথা বলছ ? পঞ্জিকা না থাকতো তো না থাকতো ! কাগজ-কল ! কাগজ-কল না গুষ্টির মাথা !

কাগজ-কলের ওপর গয়ারামের ভারি রাগ ! বললে, কল এলো না যম এলো। গাঁয়ের সদর রাস্তার ওপর লাইন বসলো। দিন নেই রাত নেই ঘ্যাচাং-ঘ্যাচ্, ঘ্যাচাং-ঘ্যাচ্ গাড়ি চলেছে তো চলেছেই ! লোকে কত আর হাতড়ে হাতড়ে চলবে বাবা ! বেধড়ক্ গিয়ে পড়লাম লাইনের ওপর। বাস, মাথাটা যায়নি এই যথেষ্ট !

বিড়িতে টান দিয়ে ধোঁয়া বের করে আবার বললে, আমার মাথা গেল না, পা গেল। কিন্তু মাথাও গেল একটা মেয়ের। দুধের কেঁড়ে মাথায় নিয়ে গয়লা-বুড়ী যাচ্ছিল দুধ বেচতে, সেই যে গেল—জন্মের মতন গেল। মারে হরি তো রাখে কে ! বাবা ইঞ্জিন এসে পড়লেন গায়ের ওপর ! হাতীর মতন ইঞ্জিন আর এই এতটুকু মানুষ—চাকার নীচে একেবারে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেল। নিজের চোখে দেখেছি। দুধে আর রক্তে ঠাঁইটা একেবারে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল।

অবিনাশ বললে, কেন, ওই তো ফটক করে দিয়েছে, বেড়া দিয়ে দিয়েছে, ওই দিকে ঘুরে গেলেই তো পারেন!

গয়ারাম বললে, আজকাল যাচ্ছে। কিন্তু প্রথম প্রথম যেতো না। ঘুরে ঘুরে যাবেই বা কেন বলতে পার? গয়লা পাড়ায় যাবার সোজা রাস্তা তো এইটে—ওই লাইনের ওপর দিয়ে। সেই সোজা রাস্তা ছেড়ে ওই দিকে ঘুরে ঘুরে মানুষ যাবে কেন হে? বলতে পার, তোর ওই কাগজ-কল আর ইঞ্জিনের ভয়ে। সেই জন্যেই তো বলছিলাম—কল না গুষ্টির মাথা!

অবিনাশ বললে, কিন্তু এইখানে ওই কল হয়েছে বলে কত লোক কাজ পেয়েছে, কত লোক রোজগার করছে, কত লোক টাকা পাচ্ছে—।

গয়ারাম তবু স্বীকার করবে না! বললে, তা সে যারা পাচ্ছে, তারা পাচ্ছে, আমার কি! আমি পেয়েছিলাম অবশ্য দশ বিঘে জমি বিক্রি করে দশ হাজার টাকা। তা জমি গেল, জায়গা গেল, ক্ষেত গেল, খামার গেল, টাকাই কিছু পেলাম। আমার মতন আরও অনেকে পেয়েছিল। তারা সব বসে বসে খেয়ে ফেললে। কাঁচা টাকা জলের মত খরচ হয়ে গেল। টাকা কতদিন থাকে বলতে পার? তবে হ্যাঁ, আমার টাকাটা আছে—আমি সেটাকে সুদে খটিয়েছি। সবাই তো আর তা পারে না!

বিড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল তবু গোটাকতক টান দিয়ে দেখলে, ধোঁয়া যখন আর কিছুতেই বেরুলো না তখন টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গয়ারাম বললে, এবার আমি উঠলাম তাহলে। আমার নাম গয়ারাম গাঙ্গুলী। বামুন আমি। যার কাছে আমার নাম করবে সেই আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

এই বলে খোঁড়া গয়ারাম চলে গেল।

বুড়ো যখন বাড়ি ফিরল, বেলা তখন দুপুর।

গিন্নি তো রেগেই আগুন! বলে, ঠিরিক্ ঠিরিক্ করে যাচ্ছ আর আসছ—হলো কিছু ঠিক? বল, নইলে আমি আমার পথ দেখি!

পানগুলি গিন্নির হাতে দিয়ে কর্তা বলে, থাম না বাপু, দিন তুই সবুর কর।

গিন্নি বলে, তুমি কর। আমি কিন্তু চললাম।

চোখ টিপে কর্তা একটু রসিকতা করতে ছাড়ে না। বলে, কার সঙ্গে?

বলে আর হাসে।

গিন্নি বলে, রাখো তোমার হাসি। হাসি দেখলে গা জ্বালা করে।

বুড়ো গয়ারামের হাসি বন্ধ হয়। এবার সে গম্ভীর হয়ে ঠেঙ্গো তুটি হাতের কাছে নামিয়ে রেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে। বসে বসে আপন মনেই হিসেব করে, হারুর কাছে পনেরো, টিকে মহল্লায় তিরিশ আর মথন শুঁড়ির দরুন পঁচিশ! কত হলো?

আঙ্গুল গুনে বুড়ো যোগ করে নেয়। তারপর হারু আবার কিছু চেয়েছে তার ভাইএর জন্যে। সেও ধর পঞ্চাশের কম নয়।

এমনি করে টাকার হিসেব করে গয়ারাম ডাকলে, গিন্নি! বড় গিন্নি!

—কি বলছ? বলি এখনও যে বসে রইলে, চান করবে না? খাবে না?

—হ্যাঁ এইযে উঠি। আমার চানের জল দাও।

—জল তোমার ঠিক করাই আছে।

গয়ারাম উঠলো। ছোট একটা কাঠের চৌকির পাশে নামানো ছিল তু' বালতি জল। আর এক বাটি তেল।

চৌকিতে বসে গয়ারাম তেল মাখলে, স্নান করলে, তারপর বললে, হরিবোল! হরিবোল! এবার দাও—ভাত দাও।

গিন্নি তার ভাত বেড়েই রেখেছিল কলাপাতার ওপর।

গয়ারাম জিজ্ঞাসা করলে, কলাপাতা কেন? পাতার বুঝি দাম লাগে না?

গিন্নি বললে, থামো! থালা বাসন সব আমি সিন্দুকে ঢুকিয়ে ফেলেছি।

গয়ারাম বলে, বেশ করেছ। দুধের রোজ বন্ধ করে দিয়েছ তো?

—দিয়েছি। কিন্তু তোমার লোক কই?

গয়ারাম বলে, লোক আসছে—দেখ না। একজন লোক খুঁজছিলাম, এক জোড়া মিলে গেল।

—একজোড়া মানে?

—এটা আর বোঝ না? স্বামী আর স্ত্রী দুজন।

কথাটি গিন্নির বোধকরি ভালই লাগল। লোক চাই বাড়ি আগলাবার জন্যে। স্বামী স্ত্রী দুজন যদি থাকে তো সহজে ওরা পালাবে না।

গয়ারাম খেতে বসলো, গিন্নি গেল পাশের ঘরে। পাশের ঘরে গিয়েই সে হাত'পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো।

বুড়ী ভাইএর জন্যে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে আর বলে, বাপের ভিটে কতদিন দেখিনি ভগবান! গিয়ে কি দেখব? দেখব দাদা নেই, কুল গাছের সব কুলগুলি বাঁদরে খেয়ে ফেলেছে!

বুড়োর কিন্তু ভাল লাগে না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, কেঁদো না গো—কেঁদো না।

বুড়ীর কান্নার আওয়াজ আরও বাড়তে থাকে। বলে, আমি কাঁদছি দাদার জন্যে। তুমি থামো।

বুড়ো বল্লে, দাদার জন্যে নয়, কুলের জন্যে।

ভাগ্যিস্ কথাটা বুড়ী শুনতে পায় না, নইলে তার কান্নার জোর হয়ত বেড়ে যেতো।

হাত মুখ ধুয়ে বুড়ো বলে, কাঁদো তুমি বসে বসে, আমি চললাম।

এই বলে বুড়ো সত্যিই বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

পথে গিয়ে মনে পড়লো, যাদের সে আসতে বলেছে তারা যদি আসে!

তার যাওয়া আর হয়ে উঠলো না। বুড়ো আবার ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে বাড়ি ফিরে এলো।

বাড়ীতে এসে খামোখা বসে রইলো সন্ধ্যে পর্যন্ত—কেউ এলো না।

তাহলে কি তারা মিথ্যা কথা বললে?

লোকটি একা নয়, সঙ্গে একটি মেয়ে রয়েছে। আশ্রয় তাদের নিতান্ত প্রয়োজন। মেয়েটি চমৎকার দেখতে। এত চমৎকার যে সেদিকে গয়ারামের চোখ পড়তেই সে থম্‌কে থেমেছিল। মেয়েটি যদি তার সঙ্গে না থাকতো তা হলে হয়ত সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপই করতো না। মেয়েটির হাতে ছিল সোনার চুড়ি। নেহাৎ ছোট জাত বলেও মনে হলো না।

ছোকরার গলায় ছিল তুলসীর মালা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গৌরবর্ণ গায়ের রং, বয়সও খুব বেশি নয়।

গয়ারাম একবার ভাবলে, যাবে নাকি তাদের খোঁজে? আবার ভাবলে, খোঁড়া মানুষ, ঠেঙ্গো নিয়ে ঠুক্‌ঠুক্ করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোথাই বা খুঁজবে তাদের?

দিনের বেলায় যেখানে দেখেছিল সেখানে তাদের পাবে না নিশ্চয়ই। হয়ত বা কোথাও আশ্রয় পেয়েছে কিম্বা হয়ত মেয়েটা তার বিয়ে-করা বউ নয়।

মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে—এমনও হতে পারে। হয়ত-বা সেই ভয়েই এলো না।

এমনি সব এলোমেলো অনেক কথাই ভাবতে লাগল গয়ারাম।

লোকটা বলেছিল, 'বানে ভেসে এসেছি আমরা।'

সত্যিই তো! নদীতে যে রকম বান, তারাই বা যাবে কেমন করে?

গয়ারাম তার গিন্নিকে ডাকলে, ওগো শুনছো?

সাড়া না পেয়ে বললে, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

গিন্নি বললে, না ঘুমোইনি। কি বলবে বল।

গয়ারাম বললে, যাবে কেমন করে শুনি?

নদীতে বান ডেকেছে। হড়পা বান, খেয়া বন্ধ।

গিন্নি চুপ করে রইলো। কথাটার জবাব দিলে না। গয়ারাম তখন আপন মনেই বলে চললো—

রাত্তির বেলা বান এলো, আজ কত গাঁ যে ভেসে গেল, কত মানুষ যে হাবুডুবু খেয়ে মরে গেল, কত গরু, কত ছাগল, কত ভেড়া—এই তো আজ আমি নিজের চোখেই দেখে এলাম দু'জনকে। আমাদের এই মিহিরপুরের ঘাটে এসে লেগেছে, শুনছো?

বুড়োর চেয়ে বুড়ীরই যাবার বেশি তাড়া!

বুড়ী ভাবলে, এটা বোধহয় বুড়োর না যাবার ছুতো। তাই সে রাগ করেই বলে বসল, আমি যাব না। চুপ কর তুমি।

বুড়ো বললে, রাগের কথা নয়। আমি সত্যি বলছি।

যাকে হোক জিজ্ঞাসা কর। এই তো কাছেই নদী।

বুড়ী বললে, আবার চেঁচায়!

বুড়ো গয়ারাম বোধ করি তার ভয়েই চুপ করে রইলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর, আপন মনেই বলতে লাগল,

আমার কি! আমি কালকেই লোক নিয়ে আসব, তারপর তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মোট-পোঁটলা বেঁধে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব নদীর ঘাটে।

নৌকো যদি চলে তো যাব ; না চলে, ফিরে আসব। খোঁড়া পা আর এই দুটো ঠেঙ্গো নিয়ে সাঁতার কেটে তো যেতে পারবো না। আমার বয়ে গেল।

পরের দিন সকালেই গয়ারাম বেরিয়ে পড়লো লোকের খোঁজে।

কিন্তু সে লোকটিকে পাবে কোথায়?

কাল যেখানে তাকে সে দেখেছিল সেইখানে গিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। কেউ কোথাও নেই।

কাকেই বা জিজ্ঞাসা করে!

কাছেই ছোট সাহেবের বাংলো। কাগজ-কলের কারখানায় আর আফিসে বড় বড় কাজগুলো যারা করে তারা সবাই সাহেব। এই সাহেবটি দেখতে ঠিক ইংরেজের মত, কিন্তু ইংরেজ নয়, পাঞ্জাবী। থাকে ঠিক সাহেবের মত। কোট্ প্যাণ্টলুন পরে, মাথায় টুপিও দেয়, দুজন চাকর আর দুটো এ্যাল্‌শেশিয়ান্ কুকুর—এই তার সংসার! সাহেব বিয়ে করেনি।

বাংলোয় সে একাই বাস করে।

এই ছোট সাহেব অবিনাশকে কাজ দেবে বলেছিল। কাজেই সাহেবের খানসামাকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত।

একজন খানসামা পার হয়ে যাচ্ছিল মেহেদী বেড়ার পাশ দিয়ে। গয়ারাম ডাকলে, 'ওহে ও ছোকরা, শোনো!

খানসামা কাছে এসে দাঁড়াল। গয়ারাম জিজ্ঞাসা করলে, কাল এইখানে যে লোকটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেই যে মাথায় চুল, গলায় মালা, সঙ্গে একটি মেয়ে—

আর কিছু বলবার দরকার হলো না।

খানসামা তাদের সন্ধান জানিয়ে দিলে।

নদীর ধারে প্রকাণ্ড যে কুলি-ব্যারাক্‌টা আছে, তারই পাশ দিয়ে সোজা চলে যেতে হবে লাল কাঁকরের রাস্তাটা ধরে। তারপর তারই শেষ প্রান্তে যে-বাড়িটা তার নাম, 'পুরানো বাংলো।' আর সেই পুরানো বাংলোর কাছাকাছি দোতলা একটা বাড়িতে থাকে জন-পঁচিশেক চীনে মিস্ত্রি, তারই নীচের তলায় একটা ঘরে ছোট সাহেব তাদের রেখে এসেছে। রেখে এসেছে খুব খাতির করে— দু'জনকে হাওয়া-গাড়িতে চড়িয়ে।

গয়ারাম জিজ্ঞাসা করলে, ছোট সাহেব নিজে?

খানসামা বললে, হ্যাঁ।

গয়ারাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেইখানে গিয়ে হাজির হলো!

হাজির তো হলো, কিন্তু ঢুকবে কেমন করে?

গয়ারামের বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। বেঁটে বেঁটে চীনে মিস্ত্রীরা দিনরাত সেখানে ঘুরে বেড়ায়। একদিন একটা চীনে মিস্ত্রী তাকে কাছে ডেকেছিল— ইউ লেম্ ম্যান্ বলে। তারপর হাসতে হাসতে কি যে সব কথা বলেছিল তার এক বর্ণও সে বুঝতে পারেনি।

সেই দিন থেকে হাজার কাজ থাকলেও এ-পথ সে মাড়ায় না।

চারিদিকে প্রাচীর-ঘেরা উঠোনের একপাশে ছোট একটি দরজা। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবতে ভাবতে, যা থাকে কপালে বলে, ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে বুড়ো গয়ারাম বার কতক উঁকি ঝুঁকি মেরে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

উঠোনটা লোহা লক্কড়ে বোঝাই। এদিক-ওদিক দেখলে গয়ারাম। কেউ কোথাও নেই। বাড়িটা ফাঁকা। সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে মনে হলো।

গয়ারাম ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়লো—উঠোনের একদিকে প্রকাণ্ড একটা লোহার চাকা কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে আর সেই চাকাটার আড়ালে বসে আছে পেটমোটা একজন বেঁটে-খাটো চীনে মিস্ত্রী। মস্ত লম্বা একটা পাইপ টানছে, ধীরে ধীরে ধোঁয়া বের করছে, আর যার সঙ্গে কথা বলছে সে আমাদের অবিনাশ। খালি গায়ে রোদে বসে একটা ছুরি দিয়ে সে একটা বাঁশের কঞ্চি কাটছে।

গায়ারাম চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়ালো চাকাটার এ-পাশে।

ওরা কেউ টেরও পেলে না।

চীনে মিস্ত্রি বলছে, ফু-চুন। আমাল্ নাম ফু-চুন।

বলা লক্কা কাম কলে। বলা লক্কা ভেলি গুড। হামাল্ সাত লক্কা—সেভেন।

এতক্ষণ পরে সে মুখ তুলে হাতের আঙুল দেখিয়ে অবিনাশকে বুঝিয়ে দিলে—সেভেন মানে সাত। অর্থাৎ সাত সাতটি পুত্রের ভাগ্যবান পিতা তিনি।

ছোট ছোট চোখ দুটি তুলে তার এই ভাগ্যের কথা বলতে গিয়েই হঠাৎ তার নজর পড়লো—গয়ারামের দিকে।

—টুং কোন্ হ্যায় ?

অবিনাশও মুখ তুললে। বললে, আপনি! আসুন! আসুন! কাল আর যেতে পারলাম না। এইখানেই মিলে গেল একটা আস্তানা। বলতে বলতে কি যেন দেখে অবিনাশ উঠে দাঁড়াল।

চীনে মিস্ত্রীও উঠলো।

গয়ারাম জুতোর শব্দে পেছন ফিরে দেখে, পাঞ্জাবী সেই ছোট

সাহেব এসে দাঁড়িয়েছে। পেছনে প্রকাণ্ড একটা এ্যালশেশিয়ান কুকুর আর সেই কুকুরটার পেছনে কারখানার বড়বাবু। পরনে হ্যাফ্ প্যান্ট, গায়ে হাফ্ সার্ট, চোখে চশমা।

গয়ারাম তাকে চেনে। লোকটা ছুবার এসেছিল টাকা ধার নিতে। টাকায় ছুপয়সা সুদ শুনে, টাকা তো নেয়নি, উল্‌টে শাসিয়ে গিয়েছিল—তোমার এই চটা সুদের কারবার তুলে যদি না দিই তো—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোট সাহেব সোজা অবিনাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে। কুকুর আর বড়বাবু বাইরের বারাণ্ডায় একটুখানি দাঁড়ায়। অবিনাশ একরকম ছুটতে ছুটতে সাহেবের কাছে গিয়ে বলে, এই যে স্যার, আমি এখানে।

তা তুমি যেখানেই হও, সাহেবের দরকার যার সঙ্গে সে তো ওই জানালার কাছে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে! সাহেব একবার মাথার ওপর কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলে, পানি গিরে?

অবিনাশ তার হাসি কিছুতেই চাপতে পারে না। সাহেব কি পাগল নাকি? বলে—

পানি গিরবে কি সায়েব, দোতলা বাড়ি যে!

সায়েব জানালার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, কথাটা বোধকরি শুনতেও পেলে না, জবাবও দিলে না।

সাহেব বললে, বেডিং কিদার হ্যায়—তোমরা বেডিং?

বেডিং কোথায় পাব সায়েব? এখন খেয়ে বাঁচি—তারপর বেডিং। বেডিং নিয়ে বানে ভেসে আসিনি সায়েব—এমনি এসেছি—যেমন দেখছো, তেমনি।

সায়েব এবার আর বলবার মত কথা খুঁজে পায় না। বাইরে বেরিয়ে এসে কুকুরটার গায়ে হাত বুলোয়।

অবিনাশ সেই অবসরে বড়বাবুকে বুঝিয়ে বলে, আপনি যদি

কিছু নগদ টাকার ব্যবস্থা করিয়ে দেন বাবু, তাহলে একটা কম্বল-টম্বল কিনি—আর রান্নার জিনিসপত্র, খাবার ব্যবস্থা—কিছুই তো নেই।

বড়বাবু বলে, আচ্ছা।

সাহেব তখন পকেট থেকে একটী চুরুট বের করে আগুন ধরিয়েছে। বড়বাবুকে কাছে ডেকে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন সব দেখায়, আর ইংরেজীতে কি যেন বুঝিয়ে বলে।

বড়বাবু ডাকলে, অবিনাশ!

অবিনাশ কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, কাঠের কাজ তুমি জানো তো?

অবিনাশ বললে, জানি বাবু। সব জানি।

বড়বাবু বললে, এই যে পাঁচিল দেখছো—এই পাঁচিল বরাবর একটী টিনের শেড্ তৈরি করতে হবে। বড়দিনের সময় সায়েবদের জিম্‌খানা হবে এইখানে। পারবে তো তৈরি করতে?

অবিনাশ বলে, পারবো হুজুর, কিন্তু যন্ত্রপাতি কিছুই তো নেই আমার।

সব পাবে।

বড়বাবু বললে, আজ আমার বাসা থেকে তোমাদের খাবার আসবে, রাত্রে একটা বিছানাও দেবো পাঠিয়ে। কাল থেকে যা হোক কিছু ব্যবস্থা করে দেবো।

বুড়ো কিন্তু তখনও সেই চাকার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সাহেব এতক্ষণ সেদিক পানে তাকায়নি। এইবার সেদিকে তাকাতেই নজর পড়লো তার ওপর। বললে, তোম্ কেয়া মাংতা?

বড়বাবু বুঝিয়ে দিলে যে সে কিছুই মাগে নি। লোকটির বাড়ি এই গ্রামে, লোকটা সুদখোর মহাজন, টাকা ধার দেওয়া ওর কাজ।

সাহেব চীৎকার করে উঠল, ভাগো! ভাগো হিঁয়াসে। রোপিয়া তোমারা কোই নেই মাংতা।

বুড়ো আর একটি কথাও বলতে পারে না, তক্ষুনি সেখান থেকে ভেগে যায়।

আধঘণ্টাখানেক পরে বড়বাবু আবার ফিরে এল। বললে, ওহে, তুমি এক কাজ কর।

ছুরি দিয়ে অবিনাশ তখন আর-একটা বাঁশ কাটছিল। বললে, কী কাজ?

বড়বাবু বললে, এখানে তোমাদের থাকা হবে না।

অবিনাশ বললে, বেশ।

সাহেবের বাংলোর কাছে দুটো ঘর খালি আছে। যাও তোমার বউকে নিয়ে সেইখানেই যাও। সায়েবের কাছে টাকা নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করগে যাও।

বড়বাবুর আর দাঁড়াবার অবসর ছিল না, বললে, চললাম।

অবিনাশ কি বলবে বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি এক্ষুণি যেতে হবে?

বড়বাবু তখন উঠোন পেরিয়ে গেছে। দোরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষুনি যাও।

মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে অবিনাশ আবার পথে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটির দিকে পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখলে। একজন তাকে ছেড়ে চলে গেল, আর-একজন নিজে থেকে এসে জুটল। মনে মনে অবিনাশ একটু হাসলে। এই মেয়েটি আজ

যদি তার সঙ্গে না থাকত, এত তাড়াতাড়ি তার আশ্রয় হয়ত মিলত না।

পথের ধারে দেখলে সেই পা-কাটা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো ঠুক্ ঠুক্ করে অবিনাশের কাছে এগিয়ে এল। বললে, কী হলো ভাই, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আমি এসেছি।

অবিনাশ কি বলবে কিছু বুঝতে পারলে না। আশ্রয় তার চাই! এই বুড়োর বাড়িতে গেলে আশ্রয় হয়ত তার মিলবে, কিন্তু খাবে কি?

অবিনাশ ভাবছিল।

বুড়োই প্রথমে কথা বললে। বললে, ওদিকে তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

অবিনাশ বললে, সায়েবের বাংলোর কাছে কোথায় নাকি দুটো ঘর খালি আছে।

বুড়ো বললে, সায়েব বুঝি সেইখানে থাকতে বলছে তোমাদের?

অবিনাশ বললে, হ্যাঁ।

বুড়ো বললে, ও-ব্যাটা কিন্তু বিয়ে-থা করে নি। একা থাকে ওই বাংলোয়।

অবিনাশ বললে, তাতে আমাদের কি ক্ষতি?

বুড়ো বললে, লোকটা সায়েব বলে ভেবেছ বুঝি ও মানুষ নয়? ভেবেছ বুঝি তোমাদের দুঃখু দেখে ও দয়া করছে?

অবিনাশের সঙ্গে বুড়ো হাঁটতে পারছিল না। বললে, আমি খোঁড়া মানুষ তোমার সঙ্গে চলতে পারছি না, একটু দাঁড়াবে?

অবিনাশ দাঁড়াল, মেয়েটিও দাঁড়াল।

বুড়ো বললে, ছাখো আমার বয়েস হয়েছে অনেক। দেখেছিও অনেক-কিছু। আমার একটা বুদ্ধি নেবে?

অবিনাশ বললে, কেন নেব না? নেবার মত হয় তো নিশ্চয় নেব।

বুড়ো বললে, তুমি সায়েবকে বল যে আমি একাই থাকব এইখানে। থাকব আর কাজ করব। আমার বউ থাকবে ওই বুড়োর বাড়িতে। ভ্যাখো সাহেব তোমাকে কেমন ভালবাসে!

অবিনাশ বুঝলে তার কথাটা। বললে, সবই বুঝলাম। কিন্তু শুধু থাকবার জায়গা পেলেই তো চলবে না, রোজগার করবার মত কিছু কাজ চাই, নইলে খাব কি?

বুড়োর লোকের দরকার, তাই সে শুধু তাদের থাকবার জায়গার কথাটাই ভেবেছিল, কাজের কথাটা অত তলিয়ে ভাবে নি।

অবিনাশ ঠিকই বলেছে। ত্নটো মানুষ, ত্নবেলা পেট ভরে খেতে হবে। তার জন্যে চাই উপার্জ্জন। অত বড় কাগজ-কলের সাহেব, কাজ সে তাকে অনায়াসে দিতে পারে। কিন্তু লোকটা বুঝতে পারছে না—তার এই উপকারের বিনিময়ে সাহেব কি চাইবে তার কাছ থেকে!

বুড়ো ভাবলে, হয়ত-বা এতে তার আপত্তি নেই। হয়ত-বা এই মেয়েটা তার স্বার্থসিদ্ধির উপাদান। তেমন মানুষও সে দেখেছে নিজের চোখে।

তবু সে একবার শেষ চেষ্টা করলে। বললে, এখানে রোজ-হাজ্‌রিতে দিন-মজুরী করার চেয়ে স্বাধীনভাবে কিছু করাই বোধহয় ভাল।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, কি করবো?

বুড়ো বললে, আমাদের পাড়ায় একটা গোলদারী দোকানের ভারি অভাব। তাই যদি কর তো খুব ভাল চলবে।

অবিনাশ বললে, দোকান করতে টাকার দরকার। আমি টাকা কোথায় পাব?

বুড়ো হাসলে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললে, যার বউয়ের গায়ে অত গয়না, তার টাকার ভাবনা? এই গয়না জিনিসটা ভারি মজার। আভরণ পেট-ভরণ—দুই-ই।

অবিনাশ বললে, কিন্তু যার গয়না সে যদি না দেয়?

—দেবে না?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে, না।

বুড়ীর কথা মনে পড়ল বুড়োর। বললে, মেয়ে জাতটাই অমনি। সব সমান। গয়না কেউ সহজে দিতে চায় না। না দিক্‌গে! আমি দেব। তুমি মাসে-মাসে কিছু কিছু করে দিয়ে শোধ কোরো।

অবিনাশের মন কিন্তু সায় দিলে না। দোকানদানি ব্যবসাদারী তার ধাতে সইবে বলে মনে হয় না।

বললে, আচ্ছা দেখি সায়েব কি বলে। সুবিধে যদি না হয় তো তোমার কাছেই যাব।

অবিনাশ আর দাঁড়াল না। এগিয়ে গেল সাহেবের বাংলোর দিকে।

বুড়ো সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, আচ্ছা তাই গ্যাখো। আমার নাম মনে আছে তো? গয়ারাম গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলী-মশাই বললে সবাই দেখিয়ে দেবে আমার বাড়ি। সোজা চলে যাবে বাজার পেরিয়ে হাটতলা। তার পরেই বাঁ-হাতি ছোট গলির ভেতর।

অবিনাশ পথ চলতে চলতে বললে, ঠিক আছে। আমার মনে থাকবে।

বাংলোর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল অবিনাশ।

প্রকাণ্ড দুটো কুকুর রয়েছে সুমুখে। যাবার উপায় নেই।

কুকুরের চীৎকার শুনে সাহেব নিজেই বেরিয়ে এল। বেরিয়েই আবার ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একজন বাঙালী বাবু ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল বাংলো থেকে। সায়েব বোধহয় তাকে পাঠিয়ে দিলে।

অবিনাশের কাছে এসে সে বললে, এস আমার সঙ্গে।

তাদের দু'জনকে সে নিয়ে গেল বাংলোয়।

চমৎকার সাজানো ঘর। মেঝেয় কার্পেট পাতা। ফুলদানিতে টাট্‌কা ফুল। চারিদিকে চেয়ার পাতা।

অবিনাশকে আর মেয়েটিকে বসতে বলে কর্ম্মচারীটি বসল।

অবিনাশ কিন্তু বসল না। মেয়েটিও দাঁড়িয়ে রইল জড়সড় হয়ে।

কর্ম্মচারী তাকে দ্বিতীয়বার আর বসতে বললে না। শুধু বললে, তোমার নাম কি ?

—অবিনাশ দাস।

—সত্যি বলছ তো ?

অবিনাশ বললে, নাম ভাঁড়াবার মতন অপরাধ কিছু তো করি নি রাজাবাবু, তাহলে বাপের-দেওয়া নামটা কেন লুকোব বলুন !

কর্ম্মচারীটি গম্ভীরভাবে তার মুখের পানে তাকালে। বললে, করেছ। অপরাধ করেছ বলেই বলছি।

—কি অপরাধ আজ্ঞে ?

—কেন, নিজে জানো না ?

অবিনাশ বললে, আজ্ঞে না।

—হুঁ। বলেই কর্ম্মচারীটি চোখ বুলিয়ে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিলে। তারপর মেয়েটির দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, এ মেয়েটিকে তুমি কোথায় পেলে ?

এ আবার কি ধরণের প্রশ্ন? অবিনাশের সন্দেহ হলো। বুড়ো গাঙ্গুলী তাহলে ঠিকই বলেছিল!

কি জবাব দেবে অবিনাশ ঠিক করতে পারছিল না।

লোকটি বললে, ছাখো, আমরা সব খবর পেয়েছি। পুলিশ তোমার পিছু নিয়েছে।

পুলিশের নামে অবিনাশের মত মানুষের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ওই অপরিচিতা মেয়েটি যতক্ষণ তার সঙ্গে আছে!

লোকটি তাকে আশ্বাস দিলে। বললে, তবে এখানে যতক্ষণ আছ, তোমার কোনও ভয় নেই। সায়েবের কাছে থাকলে পুলিশ তোমার কিছুই করতে পারবে না।

অবিনাশ হাত জোড় করে কার্পেটের ওপরেই উবু হয়ে বসে পড়ল। বললে, সেই জন্যেই তো এলাম হুজুর আপনাদের আশ্রয়ে।

অবিনাশ যে সত্যই অপরাধী সে-সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই রইল না ভদ্রলোকের।

বললে, তাহলে তুমি এক কাজ কর। মেয়েটি এইখানে থাক্। তুমি চল আমার সঙ্গে। কোম্পানীর ষ্টোর থেকে তোমার কাজ করবার যন্ত্রপাতি বের করে দিই, আর বাজার থেকে তোমার যা-যা দরকার সব-কিছু কিনে দিইগে।

জলের মত সব-কিছু স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে গেল অবিনাশের কাছে। অবিনাশ বুঝতে পারলে সে কোথায় এসেছে।

অবিনাশ তেমনি হাত জোড় করেই একটুখানি এগিয়ে এল লোকটির কাছে। তারপর চুপিচুপি বললে, আমি সবই বুঝলাম রাজাবাবু। কিন্তু এটা আপনি কি করলেন?

কাকে বলছে অবিনাশ? লোকটি তখন তন্ময় হয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। এত ভাল করে মেয়েটিকে সে

দেখে নি এতক্ষণ। অবিনাশের কথাটা বোধহয় সে শুনতেও পেলে না।

অবিনাশ আবার ডাকলে, হুজুর!

এতক্ষণে হুজুরের ধ্যান ভঙ্গ হলো। মুখ ফিরিয়ে বললে, অ্যাঁ?

অবিনাশ বললে, দেখলেন তো হুজুর?

—ও, হ্যাঁ। কি বলছিলে তুমি?

অবিনাশ বললে, তাহলে আর সায়েবের খপ্পরে কেন ফেলছেন হুজুর?

হুজুরের মাথাটা ঘুরে গেল। মাথা ঘুরবার মতনই কথা। কি জবাব দেবে, কি ব্যবস্থা করবে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে। এত সহজে এমন একটা কথা যে অবিনাশ বলে বসবে তা সে ভাবতেও পারে নি।

অবিনাশই ব্যাপারটাকে আরও সহজ করে দিলে। বললে, আপনি হলেন গিয়ে বাঙালী, স্বজাতি, মানে একবারে ঘরের মানুষ বললেই চলে। তার ওপর আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি বড় সজ্জন ব্যক্তি। আপনার নামটি কি বাবু?

লোকটি বললে, আমার নাম কাঙালীচরণ চক্রবর্তী।

অবিনাশ বললে, তাহলে আজ সন্ধ্যেবেলা কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা করব বলুন!

কাঙালীচরণ ভেবে কোনও কুলকিনারা পেলে না। বললে, থাকব তো আমি কারখানার তিন নম্বর গেটে। কিন্তু তোমরা কোথায় থাকবে?

অবিনাশ বললে, আমাদের থাকবার একটা জায়গা আছে বাবু, সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি এসেছিলাম কাজের সন্ধানে। আমার চাই একটা কাজ।

কাঙালীচরণ বললে, কাজ তোমাকে আমি দিতে পারতাম, কিন্তু আর তো আমাদের কাগজ-কলে তোমার কাজ করা চলবে না মিস্ত্রি! আচ্ছা যাও, তোমরা চট্ করে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমি যা হোক্ একটা কিছু বলে আসি সাহেবকে।

কিন্তু এমনি দুর্দৈব, ঠিক সেই সময়ে পেছনের দরজার পর্দা সরিয়ে পাইপ্ মুখে দিয়ে সাহেব এসে দাঁড়াল!

বললে, কেয়া হুয়া?

কাঙালীচরণ বললে, সব অল্ রাইট্ হুয়া সাহেব। ওদের একটা খুব আরজেন্টলি কাজ আছে সার্, সেইটা সেরে ওরা টুডে ইভ্নিং সারটেন্লি কাম্ হিয়ার।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, পুলিশকা বাৎ সম্ঝায় দিয়া?

কাঙালীচরণ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, ওরা নেই। অবিনাশ তখন মেয়েটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে সেখান থেকে।

কাঙালীচরণ বললে, ইয়েস্ সার্, পুলিশকা বাৎ শুন্কেই তো ভয়ে একবারে পুকুর-পুকুর কর্কে রাজি হো গয়া। আমি কামিং সার, ওদের আবার ভাল করে আণ্ডারষ্টেণ্ডিং করকে এগেন্ কামিং সার!

কাঙালীচরণ একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অবিনাশরা তখন ফটকের বাইরে।

কাঙালীচরণ হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছে।

অবিনাশের কাছে এসে বললে, তাহলে এই কথা রইল তোমার সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা কারখানার তিন নম্বর গেটে আমি থাকব, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাবে তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানে। কিন্তু খবরদার, সায়েব যেন না টের পায়!

অবিনাশ বললে, না না, সায়েব কিছু টের পাবে না--আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কাঙালীচরণ আর বেশিক্ষণ থাকতেও পারলে না অবিনাশের কাছে। সাহেব যদি কিছু সন্দেহ করে! তার চেয়ে সোজা কারখানায় চলে যাওয়াই ভাল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, সাহেব বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কাঙালীচরণ সেইখান থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, আই গো টু কারখানা সার। মেনি মেনি ওয়ার্ক দেয়ার।

বলেই সে চলে গেল। অবিনাশ যেদিক দিয়ে গেল, ঠিক তার উল্‌টো দিকে। কাজ কি বাবা! যদি সন্দেহ করে!

অবিনাশ ইচ্ছে করলে সোজা হাটতলায় গিয়ে গাঙ্গুলীমশাইএর বাড়িটা খুঁজে খুঁজে ঠিক বের করতে পারত, কিন্তু সোজা রাস্তায় না গিয়ে সেও বাঁকা পথ ধরলে।

কাঙালীচরণদের সে চেনে। যে লোভ তাকে সে দেখিয়েছে তার জন্যে সে তার জীবন দিয়ে দিতে পারে। অবিনাশের পিছু পিছু এসে তার থাকবার জায়গাটা দেখে যাওয়া তার পক্ষে এমন কি শক্ত!

অবিনাশ সাইডিং-লাইনটা পার হয়ে গিয়ে টিকে-মহল্লার পথ ধরলে। সেখান থেকে সোজা মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেল মিশনারী কুষ্ঠাশ্রমের দিকে।

তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে শেষে যখন হাটতলায় এসে পৌঁছোল, দোকানে-দোকানে তখন আলো জ্বলেছে।

এবার রাস্তার কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে নেবে—গাঙ্গুলীমশাইএর বাড়ি কোনটি।

কাউকে ডাকবার দরকার হয় না কিন্তু। লোকজন সব আপনিই দাঁড়িয়ে পড়ে। মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে বলে, কোথায় যাবেন আপনারা?

অবিনাশ বলে, খোঁড়া গাঙ্গুলীমশাইকে চেনেন?

একজন ছোক্‌রা মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কথাটা হয় সে শোনে নি, আর নয় তো জবাব দেওয়া প্রয়োজন বলে মনেই করে না।

সঙ্গে সঙ্গে আর-একজন এসে হাজির!

—কোথায় যাবে বললে?

অবিনাশকে আবার বলতে হয়, গাঙ্গুলীমশাইএর বাড়ি।

—খোঁড়া?

অবিনাশ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটি একটু হেসে বলে, গাঙ্গুলীমশাই বললে বুঝতে একটু দেরি হবে। সুদখোর গয়ারাম বললে চট্‌ করে বুঝতে পারবে সবাই। এস আমার সঙ্গে।

খানিকটা গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। তারপর আঙুল বাড়িয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলে, পথের পাশে ওই যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—ওই যে ইঁটের পাঁচিল—

অবিনাশ বলে, এবার ঠিক চিনতে পারব। যান আপনি। আর আসতে হবে না।

আসতে হবে না বললে কি হবে, সে আসবেই।

দরজা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসে বলে, এই বাড়ি।

হাতদুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ে অবিনাশ বলে, প্রণাম! প্রণাম!

বাড়ির ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া যায়ঃ কে!

—আমি অবিনাশ। সেই—যাকে আপনি আসতে বলেছিলেন।

—যাই।

যাই বলেই চুপ!

আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে এখানে? তাহলে কি বুড়োর ইচ্ছা নেই তাদের এখানে রাখবার?

কপাটে কোথাও ফুটো আছে কি না দেখবার চেষ্টা করে অবিনাশ।

ফুটো একটা কেন, অনেকগুলোই রয়েছে। অবিনাশ সেইখানে চোখ রেখে দেখলে, বুড়ো গাঙ্গুলীমশাই হাত জোড় করে বলছে, দাও মরুক্‌গে, এই হাত জোড় করছি আমি, দাও ঠেঙো দুটো।

ব্যাপার দেখে অবিনাশ হেসে ফেললে।

স্ত্রী বোধহয় তাঁর ঠেঙো দুটো কেড়ে নিয়েছে।

কি অপরাধে তার এই শাস্তি অবিনাশ বুঝতে পারলে না। শুধু শুনলে নারীকণ্ঠের জবাবঃ দেব না বলেছি যখন, তখন কে দেওয়াতে পারে! বুকে হেঁটে যাও।

বুড়ো বললে, বেশ, যাব না। আসতে বলেছিলাম তাই এসেছে। ওদেরই বাড়িতে রেখে আমরা যাব ভেবেছিলাম।

এবার দেখা গেল, ঠেঙো দুটো হাতে নিয়ে বয়িয়সী এক মহিলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বুড়োর কাছে গিয়ে বললে, তা সেকথা এতক্ষণ বলতে কি হয়েছিল!

বুড়ো তক্ষুণি উঠে গিয়ে দোর খুলে দিলে।

হাসতে হাসতে অবিনাশ ঢুকলো, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি এল।

অবিনাশ হাতজোড় করে নমস্কার করলে গয়ারাম গাঙ্গুলীকে।

গয়ারাম সদর দরজার খিলটা বেশ ভাল করে এঁটে দিয়ে মুখ ফিরিয়েই দেখলে, অবিনাশ নমস্কার করছে। বললে, খুব ভক্তি যে?

অবিনাশ বললে, ওরে বাবা, ব্রাহ্মণ আপনি, তার ওপর আপনি বড় খাঁটি কথা বলেন।

—কি রকম শুনি! এস এস, বসবে এস ভাল করে।

তারপর মেয়েটির দিকে নজর পড়তেই বললে, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কেন গো মা-লক্ষ্মী, গিন্নির কাছে যাও।

গিন্নি নিজেই এগিয়ে এসেছিল মেয়েটির কাছে। মেয়েটি তাকে গড় হয়ে প্রণাম করলে। গাঙ্গুলী-গিন্নি তাকে আশীর্বাদ করে ভেতরে নিয়ে গেল।

গয়ারাম বলে দিলে, মেয়েটি কিন্তু বোবা। কথা বলতে পারে না।

—আহা এমন সুন্দর মেয়ে, কথা বলতে পারে না কি গো!

মেয়েটিকে নিয়ে সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

অবিনাশকে নিয়ে গয়ারাম তখন দাওয়ায় এসে বসেছে।—নাও কি বলছিলে বল।

অবিনাশ বললে, আপনার কথা শুনে তখন সায়েবের কাছে না গেলেই পারতাম।

বুড়ো খুশীতে একেবারে ডগোমগো হয়ে উঠলো।—হেঁ হেঁ বাবা আমি যা বলি তা একেবারে খাঁটি কথা। ওই মেয়েটি তোমার সঙ্গে না থাকলে তোমার সঙ্গে কেউ কথাই বলতো না। তোমার হাতে ওটা কি? সেদিনও দেখেছিলাম, আজও দেখছি।

একটা বাঁশ ছুরি দিয়ে কেটে একটা 'গাব্‌গুবাগুব্‌' তৈরি করছিল সে। বললে, একটা বাজনা তৈরি করব।

—তুমি গান গাইতে পার?

অবিনাশ বললে, পারি।

গয়ারাম এবার তাকে তার বাড়িখানা দেখিয়ে বললে, রাত্তির হয়ে গেল, নইলে তোমাকে ভাল করে দেখাতাম। আমার বাড়ি একেবারে ফাস্টো কেলাস্‌।

তা সত্যি। একতলা দালান বাড়ি। অনেকখানি জায়গা।

অনেকগুলো ঘর। উঠোনের একদিকে কুয়ো, কুয়োর পাশে রান্নাঘর। অভাব কিছু নেই।

গয়ারাম এবার ভাল করে চেপে বসলো। বললে, এবার কাজের কথা হোক্। শোনো। এই বাড়ি আমি বিক্রি করব। পঞ্চাশ বিঘে জমি ছিল আমার। সব বিক্রি করেছি। এও করব।

কথাটা শুনে অবিনাশ একটু অবাক হয়ে গেল। বললে, এ কি কথা বলছেন আপনি? আমাদের এখানে থাকবার জন্যে ডেকে আনলেন, আবার বলছেন বিক্রি করবেন—

—আরে বাবা, বিক্রি কি বলবামাত্র হবে নাকি? লোক আসবে, দেখবে, দরদস্তুর হবে, সে অনেক দেরি।

এই বলে সে তার নিজের কথা আবার বলতে লাগল। বললে, শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পেলাম। ভাল সম্পত্তি তাই সেইখানেই বাস করব ভেবেছি। তোমাকে এখানে কি কি করতে হবে ভাল করে মন দিয়ে শোনো। পিথম্ নম্বর কথা হচ্ছে—এই বাড়ির খদ্দের মাঝে মাঝে আসে, আর না যদি আসে তো খদ্দের জুটিয়ে নিতে হবে। কিন্তু পাঁচ হাজারের একটি পয়সা কম হলে চলবে না। কম যদি কেউ বলে, তুমি তক্ষুণি ঘাড় নেড়ে দেবে। বলবে, না, হুকুম নাই। আর, পাঁচ হাজারে যদি কেউ রাজি হয়, নিশ্চয়ই হবে; বাস্, তক্ষুনি একখানি চিঠি। গয়ারাম গাঙ্গুলী। রাঙ্গামাটি-পণ্ডিতপুর। জেলা বাঁকুড়া। ডাকঘর গাঁ ওই একই। রাঙ্গামাটি-পণ্ডিতপুর। একটি কাগজে বরং লিখে নাও। লেখাপড়া জানো তো?

অবিনাশ বললে, কিছু কিছু জানি।

—বেশ, বেশ। তাহলেই হবে। আর দ্যাখো, কিছু টাকা এখানে আমার পাওনা আছে। টিকে-মহল্লায় সতু স্যাকরার কাছে

সাড়ে পাঁচ টাকা, বিছুমুখী বাগদিণীর কাছে ছু টাকা সাড়ে পনরো আনা। লিখে নিতে হবে, মনে থাকবে না। টাকাটি পাবে কি অম্‌নি মুনি-অডার। বুঝলে? আর হ্যাঁ, তোমার এই বাড়ির ভাড়া ধর গিয়ে—আচ্ছা তুমিই বল না, ন্যায্য ধরতে গেলে ভাড়া কত হয়—তুমিই বল।

অবিনাশ ম্লান একটু হাসলে। বললে, আপনি যা বলবেন।

গয়ারাম বললে, না না তোমাকে দয়া করে আমিই যখন থাকতে দিচ্ছি, তখন তুমি যা বলবে তাই হবে।

—তা যদি বলছ তো দশটি করে টাকা দিও তুমি। হরিবোল! হরিবোল! ভাড়ার টাকাটা কিন্তু মুনি-অডার করে দিও মাসের পিথমেই। ফেলে রেখো না। ফেলে রেখেছ কি মরেছ। আর দিতে পারবে না। বাস্‌, আর আমার কিছু বলবার নেই। কাল সকালে ভাল করে সব লিখিয়ে দেবো। তোমার মনে থাকবে না।

এবার অবিনাশের বলবার পালা।

বললে, আপনি তাহলে বাড়িটা আগ্‌লাবার লোক চাচ্ছিলেন না, বাড়ির ভাড়াটে চাচ্ছিলেন।

গয়ারাম বললে, ওই একই কথা বাবা। ভাড়াটে মানেই আগ্‌লাবার লোক।

—কিন্তু আমার অবস্থা তো আপনি জানেন সবই। কি খাব তার ঠিক নেই।

বুড়ো বললে, পুরুষ ব্যাটাছেলে তুমি। ও-কথা বলতে নেই। কারবার করবে। দোকান চালাতে না পার, কাঠের কারবার করবে।

এই বলে বুড়ো একটু থামলে। থেমে বললে, এই আমি বলে রাখছি শোনো। টাকাকড়ি এমনি বসিয়ে যদি রাখো, নড়বে না

কিছুতেই। কারবার কর, দেখবে, টাকাগুলোর তখন হাত-পা বেরুবে, বাচ্চা হবে।

অবিনাশ হেসে উঠলো।

—বেশ কথা বলেন আপনি!

বুড়োও হাসলে। বললে, খাঁটি কথা বলি আমি। শোনো। বউয়ের গয়নাগুলো নাও। টাকা হলে আবার তাকে কত গয়না দেবে। এখন তোমার ওই সোনাই টাকা, টাকাই সোনা।

অবিনাশ মনে মনেই বলে, হায়রে অদৃষ্ট! আসল ব্যাপারটা যদি জানতে!

বুড়োর কথা কিন্তু তখনও শেষ হয় নি। বললে, বন্ধকী কারবার আমারও আছে। আমার কাছে তুমি বন্ধকও রাখতে পারো, বিক্রিও করতে পারো। তবে আমি বলি, বিক্রির চেয়ে বন্ধক রাখাই ভাল। জিনিসটা আবার পাওয়া যায়। টাক্‌তি দু'পয়সা মাসে, এই তো সুদ। ভারি তো সুদ, তার আবার কথা!

এবার বুড়ো তার মুখখানা অবিনাশের দিকে একটু এগিয়ে নিয়ে এসে চুপিচুপি বলে, উটি তোমার বিয়ে-করা ইয়ে নয় তা আমি বুঝতে পেরেছি। তা বেশ তো। তাই-বা ক'জন পারে!

অবিনাশ কোনও কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

বুড়ো বলে, ভালই করেছ। সায়েবের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছ, খুব ভাল কাজ করেছ। এ বরং দিব্যি নিরিবিলি—হ্যাঁ, এই দ্যাখো, কথায় কথায় আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।

এই বলে সে চীৎকার শুরু করে।—গিন্নি! বলি ও গিন্নি! শুনছো? বলি, এদের দুজনের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে যে!

রান্নাঘর থেকে গিন্নির জবাব আসে।

—সে আমি জানি। তুমি চুপ কর।

পরের দিন সকালে কুয়োর কাছে বসে বসে অবিনাশ মুখ ধুচ্ছিল, গাঙ্গুলী-গিন্নি তার কাছে এসে দাঁড়ালো। অবিনাশ চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটি জোড় করে তাকে একটি প্রণাম করলে। বললে, মা কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ বাবা, শোন। আজই আমরা চলে যাব এখান থেকে। তুমি আগে একবার নদীর ঘাটে যাও, ছাখো খেয়া চলছে কি না। যদি চলে তো অমনি আসবার পথে দুটি ঘোড়ার গাড়ি ডেকে এনো।

অবিনাশ বলে, এক্ষুনি যাচ্ছি মা।

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলে, না। চা খাও, মুড়ি খাও, তারপর যেও।

বলেই সে এগিয়ে এল অবিনাশের কাছে। বললে, গয়না-গাঁটি ওকে দিও না বাবা। সুদের দায়ে সব চলে যাবে বাছা। গেলে আর হবে না। তার চেয়ে পুরুষ-ব্যাটাছেলে, খেটে খাবে।

এই বলে বুড়ী চলে যাচ্ছিল। আবার ফিরে এলো। বললে, শুধোয় তো বোলো—দেয় না কিছুতেই। বোলো—ভুলিয়ে-ভালিয়ে দেখব, দেয় যদি তো তোমার কাছেই দিয়ে আসবো রাঙামাটি গিয়ে।

বুড়ী আবার যায়, আবার ফিরে আসে। বলে, ঘরের ভাড়া দিও দু' টাকা। যদি পার তো দিও, না পার দিও না।

বুড়ী একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে। দেখে বললে, আমি সব শুনেছি বাবা, তোমার কোনও ভাবনা নেই। নিজের বাড়ি মনে করে থাক দু'জনে। বুড়োর বিষয় খাবে কে বাবা ? ছেলে নেই মেয়ে নেই, টাকা টাকা করেই মলো।

এই বলে, গাঙ্গুলী-গিন্নি চলে গেল সেখান থেকে।

বুড়ো কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বলতে ছাড়ে না।

নদীর ঘাটে গিয়ে বলে, অবিনাশ, ভাল করে রেখেছ তো কাগজখানি ? হারিয়ো না যেন।

অবিনাশ বলে, আজ্ঞে না, হারাব না।

—ঠিক-ঠিক সব কোরো যেন, যা বললাম।

অবিনাশ বললে, করব।

খেয়াঘাটে দু'খানা নৌকো। দু'খানাই ভাড়া নিয়েছে গয়ারাম গাঙ্গুলী।

জিনিসপত্র বোঝাই করে একখানা নৌকো ছেড়ে দিলে। পরের নৌকোতে চড়লো বুড়োবুড়ী আর চড়লো রসদের প্যাট্‌রা।

কাঠের সিন্ধুকটি বুড়ো কিছুতেই আগের নৌকোয় চড়াতে দিলে না। নিজের নৌকোয় সিন্ধুকটি তুলে বুড়ো সেটি আঁকড়ে ধরে বসে রইল। কি জানি বাবা, ভরা নদী, ডোবে যদি তো সিন্দুক ধরেই ডুববে।

নৌকো ছেড়ে দিলে।—হরিবোল! হরিবোল! বুড়ো বললে, দেখো অবিনাশ, যা যা বলে গেলাম, ঠিক ঠিক কোরো। মেয়েমানুষ, দুবার বলে কয়ে দেখলেই—কাজ হাঁসিল হয়ে যাবে।

মেয়েমানুষটি তখন অবিনাশের পাশেই দাঁড়িয়ে।

থাক্ না! বোবা যারা, তারা কালা হয়। কানেও শুনতে পায় না কিছু!

গাঙ্গুলী-গিন্নি হাতের ইশারায় তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বললে।

নদীর চরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে প্রণাম করলে অবিনাশ। বললে, চলি মা তাহলে।

—হ্যাঁ বাবা এসো। ভাল করে থেকো। চিঠিপত্র দিও।

আশ্রয় মিললো অবিনাশের।

পড়ন্ত সূর্যের আলো ঝিকমিক করছে নদীর জলে। পায়ের নীচে ভিজে-ভিজে বালি গরম হয়ে উঠেছে রৌদ্রের তাতে।

কুষ্ঠাশ্রমে যাবার পথের ছুপাশে বড় বড় গাছের সারি। পথের ওপর ছায়া পড়েছে। সেই পথ ধরে অবিনাশ চললো তার সঙ্গিনীকে নিয়ে।

যেতে যেতে একটা কথাই তার মনে হতে লাগলো বারংবার—গাঙ্গুলী-গিন্নি বললে, আমি সব শুনেছি।

কোথায় শুনলে?

মেয়েটা তো বোবা!

বুড়ো বলে' থাকবে হয়ত!

আবার একটা নূতন পর্য্যায় শুরু হলো তার জীবনের। স্ত্রী চলে গেল তাকে অবজ্ঞা করে। এলো সর্ব্বনাশা বন্যা। ভেবেছিল মরবে। মরতেই সে চেয়েছিল। কিন্তু মরা হলো না। মৃত্যু যেন তার হাতে ধরে তাকে তুলে দিয়ে গেল জীবনের আর-এক ঘাটে। একা তুললে না। সঙ্গে দিলে এক সুন্দরী যুবতী। তাও আবার নির্বাক!

জীবন-দেবতার এ কি পরিহাস, না আশীর্বাদ?

কিছুই বুঝতে পারছে না অবিনাশ।

পরের দিন অবিনাশ বেরিয়েছিল একটা শুকনো লাউএর সন্ধানে। 'গাবগুবাগুব' তৈরি করবে।

ফিরতে দেরি হয়ে গেল।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পেছনে কার যেন ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল। দেখলে, সাত-লড়কার বাপ পেটমোটা সেই চীনা-সাহেবটি ছুটতে ছুটতে তারই দিকে এগিয়ে আসছে।

—কি সায়েব? খবর কী?

ফু-চুন্ তখনও হাঁপাচ্ছে।

বললে, আমাল্ নাইফ্—

অবিনাশ বললে, হ্যাঁ সায়েব, তোমার ছুরিটা আছে আমার কাছে। এনে দেবো?

হাঁ না কিছু বললে না সাহেব। তার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলো।—হুঁয়াকা কাম ছোড়ি ডিলে টুং?

অবিনাশ বললে, হ্যাঁ সাহেব, ছেড়ে দিলাম।

সাহেব বললে, ভেলি গুড্।

বাড়িটা দেখাবার ইচ্ছা ছিল না কাউকে। কিন্তু না দেখিয়েই বা থাকবে কতদিন? এমনি করেই সব চিনে ফেলবে।

চিনুক্। অন্যায় তো কিছু করেনি সে।

দোরের কড়া নাড়লে অবিনাশ।

দোরের পেছনে খুট্ করে শব্দ হলো। খুলে দিয়েছে।

অবিনাশ বললে, দাঁড়াও সাহেব, ছুরিটা এনে দিচ্ছি।

কিন্তু কে তার কথা শোনে! অবিনাশ দোরের কপাট ঠেলে বাড়িতে ঢুকতেই চীনা-সাহেবও তার পিছু পিছু ঢুকে পড়লো।

এমন করে ঢোকা বোধকরি তার অন্যায় হলো। সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা চীনা-সাহেবের আছে।

অপরাধটা চাপা দেবার জন্যে চট্ করে সে একটা উপায় ঠাউরে ফেললে। হাতের ইশারায় জল খাবার ভঙ্গী করে বললে, পানি ডে ডেও এক লোটা। ডিরিঙ্ক্।

অর্থাৎ অত্যন্ত পিপাসার্ত সে। চট্ করে এক লোটা জল না হলে তার চলছে না।

বলেই সে রকের উপর থপ্ করে বসে পড়লো। বসেই সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো।

অবিনাশ ভাবলে, তৃষ্ণার্ত অতিথিকে জল সে দেবে কোন্ পাত্রে? ভাবতে ভাবতে সে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

শিকল খুলে দুহাত দিয়ে কপাট দুটো ঠেলেই সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দেখলে—রান্নার যাবতীয় আসবাব, থালা, ঘটি, বাটি গ্লাস—বুড়ী-মা তাদের জন্য সবই রেখে গেছে।

একটা ঘটি হাতে নিয়ে অবিনাশ কূয়োর কাছে এল। দেখলে—

সদ্য স্নান করে বোবা মেয়ে তখন বাঁধানো কুয়োর চত্বরে বসে চুল শুকোচ্ছে। কালো কালো একপিঠ কোঁকড়ানো চুলের ভেতর সরু সরু আঙুলগুলি চলছে আর সেই ঝালর-ঝাঁপা চুলের আড়ালে সুন্দর মুখের একটুখানি দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে তার কানে একটি লাল পাথরের দুল। চুলের ফাঁকে রৌদ্রের ছটায় সেই লাল পাথরটা ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে আগুনের মত।

অবিনাশ থমকে থামলো। ভেবেছিল বালতি দিয়ে কূয়ো থেলে জল তুলবে। তুলে সেই টাটকা জল দেবে সাহেবকে।

কিন্তু মেয়েটির ধ্যান ভঙ্গ করতে ইচ্ছা করলো না। যেমন এসেছিল আবার তেমনি সন্তর্পণে রান্নাঘরে ফিরে গেল অবিনাশ। মাটির কলসিতে জল ছিল। সেই জল গড়িয়ে এনে সাহেবকে বললে, হাত পাতো সায়েব, আমি আস্তে আস্তে ঢেলে দিই, তুমি খাও।

ফু-চুন অঞ্জলি-দুই জল খেলে। তারপর কদমফুলের মত পাকা চুলওলা মাথাটি নেড়ে বললে, থাক্।

হাত দিয়ে জল খেতে সে জানে না।

জলে তার জামার আস্তিন ভিজে গেছে।

আস্তিনটা নিংড়োতে নিংড়োতে ফু-চুন এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলে, টোমারা ওয়াইফ্—

কূয়োতলাটা সেখান থেকে দেখা যায় না।

অবিনাশ বুড়োর ভাব-গতিক দেখে একটু রসিকতা না করে পারে না। হাসতে হাসতে বলে, চাই নাকি?

ফু-চুন সে-রসিকতা বুঝতে পারলে না। বললে, নো, ভেলি গুড্।

এ-লোকটির সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। অবিনাশ বললে, আজকের মত তুমি ওঠো সায়েব, আমি তোমার ছুরিটা এনে দিই।

ছুরি আনবার জন্যে অবিনাশ যাচ্ছিল ঘরের দিকে, ফু-চুন হাত বাড়িয়ে নিষেধ করলে। বললে, নেহি, নেহি, কাম্ টোমাল্ হোনে ডেও।

বুড়ো কিছুতেই নড়তে চায় না!

অবিনাশ ভারি বিপদে পড়লো। বললে, তুমি যাবে সায়েব? আমি চান করবো, খাবো—

বুড়ো বললে, খাও না!

সর্বনাশ! এ বলে কি?

অবিনাশ বললে, না, তা হয় না সায়েব, এর পরে তুমি একদিন এসো। আজ তোমাকে উঠতেই হবে।

এই বলে তাকে একরকম সে জোর করেই তুলে দিলে।

ফু-চুন যেতে বাধ্য হলো। সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় গিয়েও আবার সে ফিরে দাঁড়ালো। বললে, ফিন্ আয়েগা।

তাকে বিদায় করে অবিনাশ দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

কুয়োর কাছে এসে দেখে, মেয়েটি উঠেছে। বাটিতে তেল দিয়েছে, গামছা দিয়েছে, দিয়ে বালতি নিয়ে জল তুলছে।

একেবারে রাজার ঐশ্বর্য!

কিন্তু রাজার পরিধানের দ্বিতীয় বস্ত্রখানিও যে নেই! স্নানের পর পরবে কি?

মেয়েটি তার শুক্নো একখানি শাড়ি এনে নামিয়ে দিলে হাতের কাছে।

গাঙ্গুলী-গিন্নি তার সাধ্য-ভোর সব-কিছু দিয়ে যেতে কসুর করে নি।

অবিনাশ খেতে বসলো।

বাঃ, মেয়েটি রান্নাও করে চমৎকার।

খাওয়া শেষ হলে মেয়েটি তার হাতের কাছে কুড়িটি টাকা নামিয়ে দিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

—ভোজনের পর দক্ষিণা নাকি ?

অবিনাশ মুখ তুলে তাকালে। দেখলে তার হাতের চুড়ি, গলার হার, কানের দুল—সবই ঠিক আছে।

তাহলে এ-টাকা দিয়ে গেছে গাঙ্গুলী-গিন্নি।

*

* *

রীতিমত সংসার পেতে বসলো অবিনাশ।

বাজার থেকে মেয়েটির জন্য লাল চওড়াপাড় শাড়ি আনলে একজোড়া, গামছা আনলে একটি নীল রঙের। নিজের জন্যে ধুতি আর গেরুয়া রঙের আলখেল্লা, আর পায়ে বাঁধবার একতোড়া ঘুঙুর।

যে ক'টি টাকা তার সঙ্গে ছিল, তাতে সব জিনিষ হচ্ছিল না। কিন্তু হাটতলার দোকানদারেরা অবিনাশকে সবাই চিনে ফেলেছে। বললে, টাকা পরে দিয়ে যাবে। আর যদি বল তো তোমার বাড়ি গিয়ে নিয়েও আসতে পারি।

বাড়ি গিয়ে টাকা চেয়ে আনবার লোভেই ধার দিলে, অবিনাশ বুঝতে পারলে।

গাব-গুবাগুব যন্ত্রটাও তৈরি হয়ে গেছে।

পাশাপাশি ছু'খানা ঘর।

একটায় রইলো মেয়েটি, আর একটায় রইলো অবিনাশ।

সারারাত ধরে গান লিখলে অবিনাশ, আর গুন্ গুন্ করে গেয়ে গেয়ে তাতে সুর দিলে।

পরের দিন সকালে উঠেই স্নান করলে। সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে ঘুমুলো। ঘুম থেকে উঠে গায়ে দিলে আলখেল্লা, পায়ে দিলে ঘুঙুর, তারপর গাব-গুবাগুব বাজিয়ে নেচে নেচে গাইতে লাগলো—

কিছুদিন মনে মনে যতন করে'
শ্যামের পীরিত রাখ্ গোপনে।
শ্যামকে যেদিন পড়বে মনে,
চাইবি কালো মেঘের পানে—
(রাই লো !) যাবি উ-ত্তরে যাবি
সতর্ হবি,
বলবি আমি যাই দখিনে।

চমৎকার গায় অবিনাশ।

যেমন তার চেহারা, তেমনি নাচ, তেমনি গান ! গাইতে গাইতে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়।

বোবা মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

গান শেষ হতেই কাছে এগিয়ে এসে তার পায়ের কাছে গড় হয়ে একটি প্রণাম করে।

সেদিন আর সে বাড়ির বার হয় না।

সদর দরজায় খিল বন্ধ করে গানের মহড়া দেয়। বলে, কাল থেকে বেরুবো বাইরে।

কিন্তু কেই-বা শোনে তার কথা।

বোবা মেয়ে তার মুখের দিকে তাকায় আর মুখ টিপে টিপে হাসে।

অবিনাশ তার পায়ে ঘুঙুর বেঁধে আলখেল্লা পরে' মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। যেখানে গান গায় চারদিক থেকে লোক এসে জড়ো হয়।

মেয়েরা তাকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ির ভেতর।

গান শুনে পয়সা দেয়।

রোজগার মন্দ হয় না।

দামোদরের বন্যার একটি গান লিখেছে অবিনাশ। যেমন গান তার তেমনি সুর।

সেদিন থেকে সবাই যেন সেই গানটিই শুনতে চায়। সবাই বলে, তোমার সেই বান-ভাসির গানটা গাও।

অবিনাশ গায়—

শোনো সবে সাবধানে হয়ে একমন,
সন তেরশ' তিরিশ সালে
দামোদরের বান,
দু'পহর রাত্রিকালে—
দু'পহর রাত্রিকালে
কমলপুরে
প্রবেশিল বান।
বান দেখে যত লোকের উড়িল পরাণ,
বলে, কি করলে হরি!
বলে কি করলে হরি!

ভেবে মরি

হয়ে ক্ষ্যাপার পারা

গাছে উঠে দেখে বান, ছোটে তীরের পারা

হট্‌কির বোষ্টমরা—

হট্‌কির বোষ্টমরা

হয়ে ছাড়া

বোষ্টমীর সঙ্গ

উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ!

এলো বান কুলেকুঁড়ি।

এলো বান কুলেকুঁড়ি

গুড়ি গুড়ি

বান প্রবেশিল।

গমের কুঁচুড়ি সব বানেতে ভাসিল।

ভাসলো মহামায়া—

ভাসলো মহামায়া

ছেড়ে দয়া

শোনো তার রঙ্গ

ক্ষ্যাপা হলো ক্ষ্যাপা মাগী পেয়ে বানের সঙ্গ।

এলো বান পঞ্চবটী—

এলো বান পঞ্চবটী

নিলেক লুটি

ভাঙলো রাজার গড়

তুরু তুরু শবদে ভাঙে পাহাড় পাথর।

এলো বান চণ্ডীপুরে—

এলো বান চণ্ডীপুরে

বলবো কারে

কলরব ধ্বনি—
বান দেখে যত লোকের উড়িল পরাণী,
ভাসলো রাজপুত—
ভাসলো রাজপুত
যমের দূত
ফুলে হলো ঢাক।
গুড় গুড় শবদে নদীর সে কি ভীষণ ডাক!
গেল বান পরিৎপুরে—
গেল বান পরিৎপুরে
মিঞা ঘরে
ভাই-সাহেবরা কাঁদে।
বদ্‌না ভাসে, টুপি ভাসে, মুরগী পড়ে ফাঁদে।
বলে আল্লা রাখো জান!
আল্লা রাখো জান!
মেহের বান
সিন্নি দেবার কথা,
মধ্যিবানে ভেসে যায় উচ্চে তুলি মাথা।
পালায় প্রাণের ভয়ে।
পালায় প্রাণের ভয়ে
বানের ডরে
ফিরে নাহি চায়।
কোলের ছেলে ভেসে গেল করে হায় হায়!
গলেতে দিয়ে বস্ত্র—
গলেতে দিয়ে বস্ত্র
জোড় হস্ত
দ্বিজগণে কয়—

রক্ষা কর গঙ্গাদেবী হও মা সদয় !

হরির কি বিবেচনা।

হরির কি বিবেচনা

এতগুনা

মানুষ মেরে দিল।

গড়গড়ার ঘাট আজ সতী-ঘাটা হলো।

স্ত্রী-পুরুষে জড়াজড়ি গলা ধরে মলো।

হয়ত বিধির লিখন !

নইলে মরবে কেন ?

নইলে মরবে কেন—

বিপদ হেন

হতে কি আর হয় ?

কাগজ-কলের ঘাটে বান ধীরি ধীরি বয়।

লাগলো বোবা মেয়ে।

লাগলো বোবা মেয়ে

শুয়ে শুয়ে

চুড়ি ঝিন্ ঝিন্ করে।

আমায় দেখে মুখে তাহার কথা নাহি সরে।

হায় হায় কার ঘরণী !

হায় হায় কার ঘরণী

কার ঘরণী

সোনামণি

কাহার ঘরে আসে !

দেখে শুনে ক্ষ্যাপা ভোলা আপন মনেই হাসে

হাসে আর কয় না কথা !

হাসে আর কয় না কথা,

বুকের ব্যথা
লুকনো কি যায় ?
বুকের বেদন বুকেই থাকে মুখে হাসি পায়,
এবার যে সাঙ্গ হলো—
সাঙ্গ হলো বানের কথা
মরি হায় হায় !

গান শুনে সবাই তারিফ করে। পয়সা দেয়।

দিন তাদেব মন্দ চলে না।

কোনোদিন পাঁচ টাকা, কোনোদিন সাতটাকা, যেদিন যেমন পড়্‌তা।

সারাদিন নেচে নেচে গান গেয়ে সন্ধ্যায় অবিনাশ বাড়ি আসে। মেয়েটি তার আসবার অপেক্ষায় বসে থাকে। জল দেয়, পান দেয়, তারপর তামাক সাজতে বসে।

অবিনাশ কিছুতেই তাকে তামাক সাজতে দেবে না। বলে, না না ও কি করছো ?

ওকে খেতে দিচ্ছি বলে কি ও আমার তামাকও সেজে দেবে নাকি ? ও রাঁধছে-বাড়ছে, ঘরকন্নার কাজকর্ম করছে—এই যথেষ্ট।

অবিনাশ তামাক টানে আর ভাবে। ভাবে ওর কোনও ব্যবস্থাই তো করে দিতে পারলাম না ! ও কে, কোথায় ওর বাড়ি, কাদের মেয়ে, কে-ই বা বলে দেবে ?

দেখেশুনে মনে হয়, মেয়েটি বেশ ভালই আছে।

অবিনাশ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

তাকায় আর ভাবে।

এ ভাবনার যেন শেষ নেই !

একা-বাড়িতে রয়েছে তারা দু'জন। সবাই জানে তারা দুই স্বামী আর স্ত্রী।

মেয়েটির চেহারা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, দেখলে ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে বলেই মনে হয়।

পরণে শাড়ি, গায়ে গয়না, অথচ সিঁথিতে সিঁদুর নেই!

তবে কি এখনও সে কুমারী?

বোবা মেয়ে, তাই বোধহয় কেউ তাকে বিয়ে করতে চায় নি।

দামোদরের তীরে কোনও গ্রামে বাড়ি নিশ্চয়ই। তা নইলে বানে ভেসে এলো কেমন করে!

অবিনাশ ভাবে শুধু। ভেবে কোনও কুলকিনারা পায় না।

হাটতলায় গান গাইতে যায়। যারা চেনে, তারা বলে, এবার থেকে বোষ্টমীকে সঙ্গে আনবে।

কেউ কেউ-বা একটু পরিহাস করে বলে, বোষ্টমী তোমার গান জানে তো? দু'জন একসঙ্গে যদি নেচে নেচে গাও তো দেখবে এত-এত পয়সা পাবে।

অবিনাশ হাসে শুধু। হেসেই উড়িয়ে দেয় তার কথা।

রাঙামাটিতে মনি-অর্ডার করেছে অবিনাশ। একখানি চিঠিও লিখেছে সেদিন।

লিখেছেঃ আপনার বাড়ি-ভাড়ার দরুণ মাসে পাঁচটি টাকার বেশি দেওয়া আপাততঃ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিন মাসের বাড়ি-ভাড়া পনেরো টাকা পাঠালাম। এবার প্রতি মাসে নিয়মিত পেয়ে যাবেন। 'গাব-গুবাগুব' বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে গেয়ে যা রোজগার করি, তাইতে আমাদের বেশ চলে যায়। যখন চলবে না তখন অন্য পথ ধরবো। সতু স্যাকরা সেদিন আমার কাছ থেকে আপনার ঠিকানা চেয়ে নিয়েছে। বলেছে, টাকা সে আপনাকে মনি-অর্ডার করে পাঠাবে। আমার হাতে দেবে না।

কারণ আমাকে সে বিশ্বাস করে না—মুখের ওপর স্পষ্ট পরিষ্কার সে-কথা সে জানিয়ে দিয়েছে। বিন্দুমুখী বাগ্‌দিনী কান্নাকাটি করে আরও এক মাসের সময় নিয়েছে। সে দেবে। কিন্তু আপনার সন্তু স্যাকরার মতলব ভাল নয়। সে আমাকেও দেবে না, আপনাকেও পাঠাবে না। বাড়ির খরিদ্দার দু'জন এসেছিল। একজন বলে, দু'হাজার টাকার বেশি দেবে না। আর একজন ঠিক বাড়ি কেনবার জন্যে আসে নি, এসেছিল বাড়ির ভেতর ঢুকে বোবা মেয়েটিকে ভাল করে দেখতে।

অবিনাশ গান গাইতে গাইতে সেদিন কাগজ-কলের দিকে চলে গিয়েছিল মনের ভুলে।

গাইতে গাইতে হঠাৎ দেখলে, ভিড়ের একপাশে কাঙ্গালীচরণ এসে দাঁড়িয়েছে। সাহেবের অনুচর সেই কাঙ্গালীচরণ—যাকে সে কাগজ-কলের তিন নম্বর গেটে অপেক্ষা করতে বলেছিল।

গান থামতেই কাঙ্গালীচরণ এগিয়ে এলো।

—বলি ওহে ও গোঁসাই, নেচে নেচে খুব তো বান-ভাসির গান হচ্ছে! সেদিন তো খুব কথা রাখলে তুমি!

অবিনাশ হাতদুটি জোড় করে প্রণাম করলে প্রথমে। তারপর বললে, যাওয়া আর হলো না রাজাবাবু।

কাঙ্গালীচরণ বললে, পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই তাহ'লে এই মিছে কথাটি বলেছিলে তুমি?

অবিনাশ বললে, আজ্ঞে না হুজুর, পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নয়। আপনাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বলেছিলাম।

কাঙ্গালীচরণ বললে, বটে! তোমার তো দেখছি খুব আস্পর্দ্ধা! সেদিন তোমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলেই ভাল হতো।

—এ-বয়েসে ওরকম মিথ্যে কথা নাই-বা বললেন হুজুর। বলেই চলে যাচ্ছিল অবিনাশ।

কাঙ্গালীচরণ তার পিছু নিলে। বললে, শোনো গোঁসাই শোনো, রাগ করছো কেন? বলি আছো কোথায়?

অবিনাশ বললে, হাটতলার কাছে আছি একটা বাড়িতে।

কাঙ্গালীচরণ জিজ্ঞাসা করলে, সেটি কোথায়? তোমার সেই—সেইটি?

অবিনাশ বললে, সেটি আমার সঙ্গেই আছে।

এই বলে অবিনাশ আবার এগিয়ে যাচ্ছিল। কাঙ্গালীচরণ বললে, যাব একদিন বেড়াতে বেড়াতে, দেখে আসবো গিয়ে।

—কেন আর মিছেমিছি কষ্ট করবেন বাবু? আপনার মত মানুষকে সে আমলই দেবে না।

কাঙ্গালীচরণের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। বললে, তাই নাকি? তুমি আমল পেয়েছো তো?

—আজ্ঞে না। আমিও পাই নি।

—তাহ'লে সেবাদাসী করে ওকে রেখেছো কি জন্যে?

—ওর মনের মানুষটিকে খুঁজে দেবার জন্যে।

বলেই সে গান ধরলে :

আমরা সবাই খুঁজি মনের মানুষ বনের মাঝখানে।
(বল) কোথায় আছেন বনমালী (তার) ঠিকানা কে জানে॥

গান শুনে দেখতে দেখতে লোক জড়ো হয়ে গেল।

অবিনাশকে সবাই ঘিরে ধরলো। বললে, গাও গোঁসাই, নেচে নেচে গাও, আমরা পয়সা দেবো।

কাঙ্গালীচরণ বেগতিক দেখে সরে পড়লো। আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে তার ভরসা হলো না।

নিত্য নূতন গান রচনা করে অবিনাশ

আজকাল কি যে হয়েছে তার, প্রতি রাত্রে অন্ততঃ একটি নতুন গান রচনা করে তাতে তার মনের মত সুর দিতে না পারলে কিছুই তার ভাল লাগে না। গান রচনা করতে করতে দু'চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে আসে। কেমন যেন একটি অনির্বচনীয় আনন্দে তার হৃদয় মন ভরে ওঠে। মনে যেন তার আর কোনও দুঃখ নেই, কোনও আকাঙ্খা নেই। জীবন যে এত সুন্দর, জীবনের দেবতা যে এত করুণাময়—এতদিন সে-কথা সে জানতো না। এতদিন পরে তারই সন্ধান যেন সে পেয়েছে। নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে তাকে।

তিরিশ সাল একত্রিশে গিয়ে পড়ে।

বান-ভাসির গান অবিনাশের কাছে পুরনো হয়ে গেছে।

বাড়ির মেয়েরা তাকে বান-ভাসির গান গাইতে বললে অবিনাশ বলে, ও-গান পুরনো গান মা-জননী। অন্য গান গাই, শুনুন।

এই বলে সে গাইতে আরম্ভ করে ঃ

বন্ধু রে, বন্ধু আমার—! ভেবেছিলে
খেল্‌না দিয়ে ভুলিয়ে দেবে সাতটা রঙে রাঙানো,
রইলো তোমার খেলনা বন্ধু, ঘরের কোণে টাঙানো!
(আমি) তোমাকে চাই বন্ধু আমার, চাই না তোমার খেলোনা!
কোথায় তুমি লুকিয়ে থাকো বন্ধু আমায় বলনা!
ধরা দিয়েও দাও না ধরা, এ কি তোমার ছলনা!

কিন্তু এ-গান কারও ভাল লাগে না। বলে, না তুমি সেই বান-ভাসির গান গাও।

বাধ্য হয়ে অবিনাশকে আবার বান-ভাসির গানই গাইতে হয়।

গান গাইতে গাইতে অবিনাশ বহুদূর দূরান্তে চলে যায়।

এক একদিন কিছুই তার ভাল লাগে না।

নদীর তীরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

শুক্‌নো নদী। দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশি ধূ-ধূ করে। মনে হয় যেন মরুভূমি। তপ্ত বালির ওপর দিয়ে মানুষ হাঁটতে পারে না। অতি কষ্টে দু-একটা গরুর গাড়ি হয়ত ধীরে ধীরে শুক্‌নো নদী পার হবার চেষ্টা করে। এ-পারের গাড়ি ও-পারে যায়। ও-পারের গাড়ি শহরে আসে।

দুপুরের রৌদ্রে শুকনো বালি তেতে আগুন হয়ে ওঠে। আগুনের হল্‌কা বয়। তখন আর নদীর ত্রিসীমানায় লোকজন দেখা যায় না।

কোন্ এক চতুর ব্যবসায়ী একটি উটের গাড়ি তৈরি করেছে। লম্বা উট, কাজেই চার চাকার গাড়িটি দোতলা। বহুদূরের যাত্রী নিয়ে রাণীগঞ্জ শহর থেকে উটের এই গাড়িটি প্রত্যহ প্রত্যূষে দামোদরের তীরে প্রকাণ্ড একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁকুড়া যাবার যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করে।

বাঁকুড়ার যাত্রী যারা—জেলার সদর কাছারিতে মামলা-মোকর্দ্দমার জন্য তাদের না গিয়ে উপায় নেই। দামোদর পেরিয়ে অনেকখানি পথ—না আছে ট্রেণ, না আছে মোটর, পায়ে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে উটের গাড়ি অনেক ভাল। চাল-ডাল বেঁধে নিয়ে দু-একদিন আগে বেরুতে হয়—এই যা!

রান্নাবান্না করে এক বেলা বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থাও আছে। পিরুমল গোয়েঙ্কার ধর্মশালা—নদীর ঠিক এপারে। উটের গাড়িটা শুধু এইজন্যেই বোধকরি ধর্মশালার দোরের কাছটিতে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। আট আনা পয়সা দিলেই ধর্মশালার একখানা ঘর খুলে দেওয়া হয়। যে-লোকটির ওপর ধর্মশালার

দেখাশোনার ভার, একপাত খেতে যদি পায় তো সে ইন্দারা থেকে জল তুলে এনে উনুন ধরিয়ে দেয়।

অবিনাশ আজকাল এই ধর্মশালায় একবার করে আসে।

নিত্য নূতন লোকের আনাগোনা এখানে। অবিনাশের রোজগার মন্দ হয় না।

এখানে অবিনাশের আর-একটি আকর্ষণ জুটেছে আজকাল।

সাধু সন্ন্যাসী এক-আধজন আসা-যাওয়া করে বটে এই পথ দিয়ে, কিন্তু এখন যিনি এসেছেন তাঁর মত এমন ধুনি জাগিয়ে ডেরা বেঁধে বসেন না কেউ।

আজ চার দিন হলো এসেছেন এই সাধুবাবা। যেমন সুন্দর চেহারা তাঁর তেমনি সুন্দর ব্যবহার। আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে সারা ভারতবর্ষ তিনি পদব্রজে পরিক্রমা করতে চান। চলতে চলতে এখানে এসে পড়েছেন। এখান থেকে কোথায় যাবেন তিনি জানেন না। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, যিনি চালাচ্ছেন তিনি জানেন।

'আমি' কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন না তিনি। নিজেকে বলেন, কৃষ্ণদাস। সবাই কৃষ্ণ। তিনি সকলের দাস।

কৃষ্ণদাসের মুখে হিন্দী কথা শুনে অবিনাশ ভেবেছিল বুঝি-বা তিনি হিন্দুস্থানী। তারপর পরিষ্কার বাংলায় যেদিন তিনি বললেন, এই বাংলার মাটিতে কৃষ্ণদাসের জন্ম। তাই কৃষ্ণদাসকে বার বার বাংলা দেশে টেনে টেনে নিয়ে আসেন কৃষ্ণ।

অবিনাশ সেদিন বলেছিল, আমারও বড় ইচ্ছে—এমনি করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার। আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই, আপনার কী ইচ্ছে ?

কৃষ্ণদাস তাঁর চোখ ছুটি বন্ধ করে একটু হেসে বলেছিলেন, কৃষ্ণদাসের নিজের কোনও স্বাধীন ইচ্ছে তো নেই তুমি জানো কৃষ্ণ। তবে এ-ছলনা কেন করছো দাসের সঙ্গে ?

কথাটা বুঝতে অবিনাশের একটু দেরি হয়েছিল। তাই সে আবার বলেছিল, আমার পায়ে একটি বেড়ি পরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই বেড়িটি আমি খুলব কেমন করে, আপনাকে বলে দিতে হবে।

কৃষ্ণদাস হেসে উঠেছিলেন হো-হো করে।—তুমি বড় চতুর কৃষ্ণ। নিজেই পরেছ সেই বেড়ি, আবার সবাইকে জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছ কেমন করে খুলবে!

অবিনাশ সেইদিনই বুঝেছিল—এ বড় গভীর জলের মাছ। একে সহজে ছাড়া হবে না।

তার পরের দিনই তাই সে বোবা মেয়েটিকে সঙ্গে করে এনেছিল কৃষ্ণদাসের কাছে। মেয়েটি যে বোবা, সে-কথা জানায় নি তাঁকে।

বিকালের পড়ন্ত বেলায় শান্ত নদীতীর তখন ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হয়ে উঠছে। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। অশ্বত্থ গাছের পাতায় পাতায় কেমন যেন একটানা একটা সুর বাজছে।

উটের গাড়িটি কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে বাঁকুড়ার দিকে। ধর্মশালায় লোকজন কেউ নেই।

অবিনাশ প্রণাম করলে কৃষ্ণদাসকে। তার দেখাদেখি মেয়েটিও প্রণাম করলে। তারপর বসলো তারা দুজনে মুখোমুখি।

কৃষ্ণদাসের মুখে হাসি যেন লেগেই আছে।

হাসতে হাসতে বললেন, এই মায়ের কথা তুমি বলেছিলে কৃষ্ণ?

অবিনাশ বললে, হ্যাঁ। এই দামোদরের বানে ভেসে আসছিলাম। কেমন করে মেয়েটি এসে জুটলো আমার সঙ্গে, সে তো আপনাকে বলেছি।

কৃষ্ণদাস বললেন, হ্যাঁ বাবা, কৃষ্ণদাস শুনেছে সে-কথা।

—এখন বলে দিন ওকে নিয়ে আমি কি করবো।

কৃষ্ণদাস বললেন, কৃষ্ণদাসের আর কতটুকু বুদ্ধি বাবা? কৃষ্ণদাস তো বলতে পারবে না।

অবিনাশ ধরে বসলোঃ নিশ্চয়ই পারবেন। নইলে কে আমাকে বলে দেবে?

কৃষ্ণদাস বললেন, যিনি দিয়েছেন, তিনিই।

অবিনাশ হাসলে। বললে, সে ক্ষমতা আমার নেই।

কৃষ্ণদাস বললেন, তুমি কি মাকে আমার পরিত্যাগ করতে চাও?

আবিনাশ বললে, গ্রহণ কখন করলাম বাবা যে, পরিত্যাগ করবো? ও যেখানকার জিনিস সেইখানে ওকে আমি পৌঁছে দিতে চাই। তা না দিতে পারলে এই যে আমি বলছি আপনার সঙ্গে চলে যাব, ও থাকতে আমি যাই কেমন করে বাবা?

কৃষ্ণদাস মেয়েটির দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, মায়ের কি ইচ্ছে?

মেয়েটি তার কালো ঢলঢলে ছুটি চোখ তুলে সোজা তাকিয়েছিল কৃষ্ণদাসের দিকে। প্রশ্ন শুনে চোখ ছুটি নামিয়ে নিলে।

অবিনাশ বললে, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটি বোবা। কথা বলতে পারে না।

কৃষ্ণদাস বিস্মিত হলেন। আরও ভাল করে তাকালেন মেয়েটির দিকে। তারপর অবিনাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কতদিন একসঙ্গে আছ?

—তা প্রায় দশ-এগারো মাস হলো।

কৃষ্ণদাস বললেন, তাহলে ছুজন ছুজনকে চিনে ফেলেছো নিশ্চয়ই!

অবিনাশ বললে, হ্যাঁ, তা চিনেছি। বড় ভাল মেয়ে।

কৃষ্ণদাস আবার তাকালেন মেয়েটির দিকে।

অবিনাশ বললে, ভাল বলেই তো বিপদে পড়েছি। ভগবান আমার সব বন্ধন কেটে দিয়েছিলেন, ভেবেছিলাম এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু আবার এই মেয়েটিকে জুটিয়ে দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলে দিলেন।

কৃষ্ণদাস বললেন, না না, ও-কথা বোলো না। বিপদ থেকে সব সময় সবাইকে উদ্ধার করাই তাঁর কাজ। তিনি কখনও কাউকে বিপদে ফেলেন না।

এই বলে মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণদাস বললেন, এই দিকে একটু এগিয়ে এসো তো মা!

মেয়েটি এগিয়ে এসে বসলো কৃষ্ণদাসের কাছে।

কৃষ্ণদাস চোখ বুজে মেয়েটির মাথায় হাত রেখে কি যেন বললেন। মনে হলো অস্পষ্ট কণ্ঠে কি একটা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, যাও, এবার তোমরা বাড়ি যাও!

অবিনাশ কিন্তু আজ এসেছে একটা মীমাংসা করতে। বললে, আমি যে-জন্যে এসেছি তার কি হলো?

কৃষ্ণদাস বললেন, সে মীমাংসা তোমরা নিজেরা করবে। মূর্খ কৃষ্ণদাস কিছুই জানে না বাবা।

অবিনাশ কিছুতেই সে-কথা বিশ্বাস করলে না। বললে, আমি আজ কিছুতেই উঠবো না এখান থেকে।

হাসলেন কৃষ্ণদাস। বললেন, ভালই হবে। কৃষ্ণদাস সঙ্গী পাবে। সারারাত গান শুনবে।

অবিনাশের এতক্ষণ পরে মনে হলো ধরমশালা আজ একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। কৃষ্ণদাসের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা করবার কেউ নেই।

নেই তো নেই। না খেয়েই পড়ে থাকবেন। কাউকে তিনি মুখ ফুটে একটি কথাও বলবেন না। এরই নাম আকাশবৃত্তি। কোনও সঞ্চয়ও থাকবে না। ভিক্ষাও করবেন না।

অবিনাশ বললে, সারারাত গান না হয় শুনবেন, কিন্তু আজ আপনার খাবার কি হবে?

—সে চিন্তা তো কৃষ্ণদাসের নয় বাবা।

—আপাতত সে চিন্তা অবিনাশের। এই বলে অবিনাশ সোজা ধর্মশালায় গিয়ে ঢুকলো। গিয়ে দেখে, কেউ কোথাও নেই। ঘরে ঘরে তালা ঝুলছে। ডাকলে, মহারাজ!

—কৌন্ হো?

—এই যে বাবা, আমি ডাকছি। কোথায় তুমি?

ধর্মশালার পেছনে টিনের একটা লম্বা চালায় সারি সারি কয়েকটি উনুন পাতা। এইটিই বোধকরি 'রন্ধনশালা'। তারই একটি উনুনে আগুন দিয়ে মহারাজ তার পেতলের কানাউচু থালায় একতাল ময়দা নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে তার ওপর ঘুষি চালাচ্ছিল। ইঁদারার আড়ালে অবিনাশ এতক্ষণ তাকে দেখতে পায় নি।

অবিনাশ তার কাছে গিয়ে দেখলে, আর-একটা থালায় কয়েকটি আলু আর কয়েকটি বড় বড় করলা নামানো রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে, মহারাজ এত সকাল-সকাল খানা পাকাচ্ছ? কোথাও যাবে নাকি?

মহারাজ বললে, না ভাই, যাবার আর সময় কোথায়? এখান থেকে যাব সেই মরবার দিনে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, আজ তো লোকজন কেউ নেই। সাধুবাবার সেবার কি হবে? কিছু জানো?

মহারাজ বললে, জানি।

—জানো?

—হাঁ জি। আজ আমিই ওঁকে খিলাবো।

অবিনাশ ছুটে চলে এলো কৃষ্ণদাসের কাছে।—হাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি। কৃষ্ণদাসের ভাবনা আর একজন—

থম্ করে থেমে গেল অবিনাশ। কৃষ্ণদাসের দিকে তাকিয়ে মুখের কথা তার মুখেই আট্‌কে রইলো। কথা সে শেষ করতে পারলে না। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এলো গাছের তলায়।

দেখলে, মেয়েটির মাথায় হাত রেখে কৃষ্ণদাস চোখ বুজে বসে আছেন। মেয়েটিও বসে আছে দু' চোখ বন্ধ করে।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণদাস বলতে লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণে তোমার মতি হোক্ মা! তোমার আপন বলতে সেই কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি সব সময়েই তোমার সঙ্গে রয়েছেন। সেই দিকে মুখ ফেরাও।

তার পর থেমে থেমে বলতে লাগলেন, নিজেকে তুমি অশুচি ভেবো না মা, তুমি অশুচি নও, অপবিত্র নও।···এবার তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর, কি করবে।

মেয়েটির দু' চোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এলো। দু হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণদাসের সুমুখে সে লুটিয়ে পড়লো কাঁদতে কাঁদতে।

কৃষ্ণদাস বললেন, কেঁদো না মা। চুপ কর। শ্রীকৃষ্ণ তোমার মঙ্গল করবেন।

এইবার তিনি মুখ তুলে তাকালেন। অবিনাশ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললেন, ওকে নিয়ে যাও অবিনাশ। মেয়েটি বোবা নয়।

অবিনাশ চমকে উঠলো।—বোবা নয়! তবে কি বোবা সেজে ছিল এতদিন?

কৃষ্ণদাস বললেন, হ্যাঁ, বোধহয় তাই। ওকে জিজ্ঞাসা কোরো, ও তোমাকে সব কথা বলবে। হাঁ রে মেয়ে, বলবি তো?

মেয়েটি মাথা কাৎ করে জানালে—বলবে।

অবিনাশ অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়েছিল মেয়েটির দিকে।

এ কি রকম ধারা মেয়ে রে বাবা! এতদিন সে কথা না বলে বোবা মেয়ের অভিনয় করেছে! একটি দিনের জন্যেও বুঝতে দেয় নি সে বোবা নয়! আশ্চর্য! ভুলেও তো মানুষ কথা বলে ফেলে!

বললে, ও আমাকে একেবারে বুঝতে দেয় নি।

কৃষ্ণদাস বললেন, কৃষ্ণদাসই কি বুঝতে পারতো বাবা? ও নিজেই তাকে বুঝিয়ে দিলে। কানে ও শুনতে পাচ্ছে যে!

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, বোবা হলে বুঝি শুনতে পায় না?

কৃষ্ণদাস বললেন, না। বোবা যে হয়, শ্রীকৃষ্ণের এমনি করুণা, তাকে তিনি কালা করে দেন। সবাই কথা বলছে, কানে শুনতে পাচ্ছে, অথচ নিজে কথা বলতে পারছে না—এ যন্ত্রণা মানুষ সহ্য করবে কেমন করে? তাই সেই যন্ত্রণা থেকে বোবাকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন কালা করে দিয়ে।

অবিনাশ বললে, সত্যি।

বলে সে তার হাত দুটি জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে সেই করুণাময় বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে একটি প্রণাম করলে।

কৃষ্ণদাস বললেন, এবার তোমরা এক কাজ কর। খোলাখুলি সব কথা বলে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নাওগে।

অবিনাশ বললে, বোঝাপড়া আমাদের হয়ে গেছে। কথা যখন ও বলতে পারে বলছেন, তখন আর আমার চিন্তা নেই। ওকে ওর ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়বো।

কৃষ্ণদাস বললেন, বেশ।

অবিনাশ বললে, আপনার কাছে আমি দীক্ষা নেবো। আপনি আমার গুরু।

কৃষ্ণদাস হাসলেন। বললেন, কৃষ্ণদাস গুরুগিরি করে না বাবা।

অবিনাশ বললে, ও-সব বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমি মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ, গুরু না হলে আমাকে পথ দেখাবে কে?

কৃষ্ণদাস বললেন, কৃষ্ণে তোমার মতি স্থির হোক্, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।

অবিনাশ বললে, বেশ, তবে আজ আমরা যাচ্ছি। আবার কাল আসবো।

কৃষ্ণদাসকে প্রণাম করলে তারা দুজনেই। দুজনেরই মাথায় হাত দিয়ে চোখ বুজে কৃষ্ণদাস আশীর্বাদ করলেন। তারপর মেয়েটিকে নিয়ে অবিনাশ চলে গেল।

হাত জোড় করে চোখ বুজে কৃষ্ণদাস বোধকরি ধ্যান করছিলেন, ঘুঙুরের আওয়াজ শুনে চোখ চাইতেই দেখেন, মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে অবিনাশ আবার ফিরে এসেছে।

তিনি কিছু বলবার আগেই অবিনাশ বললে, দেখুন স্বামীজি, মজা দেখুন। কিছুতেই ও ঠিকানা বলবে না। খালি খালি কাঁদছে আর বলছে, তোমার মতন মানুষ আমি পাব না গোঁসাই, আমি তোমাকে ছাড়বো না কিছুতেই।

কৃষ্ণদাস বললেন, বোসো, তোমরা বোসো। উত্তেজিত হয়ো না।

দুজনেই বসলো। কৃষ্ণদাসের এপাশে একজন, ওপাশে একজন।

অবিনাশ বললে, আজ আমি তাজ্জব বনে যাচ্ছি শুধু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে। এমনি একটা সুন্দরী মেয়ে লুকিয়ে আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। সে ছিল আমার বিয়ে-করা স্ত্রী। আর এই মেয়েটা—এই কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েটা বলছে কিনা, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না!

কৃষ্ণদাস হাসলেন। হেসে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, তোমার নাম কি মা?

মেয়েটি বললে, বাসন্তী।

—বাড়িতে কে আছে তোমার ?

বাসন্তী মাথা হেঁট করে চুপ করে রইলো।

—বলতে চাও না ?

বাসন্তী আবার তার আয়ত চোখ ছুটি তুললে, তারপর চোখ নামিয়ে বললে, অনেক কথা বলতে হয় তা হ'লে।

—বলই না।

বলবে বলেই বোধকরি তার গলাটা পরিষ্কার করে নিলে। কিন্তু না, বলতে বোধহয় পারছে না।

কৃষ্ণদাস বুঝলেন তার অবস্থা। বললেন, খুব যদি কষ্ট হয় তো থাক্। বলতে হবে না।

অবিনাশ কিন্তু খুশী হলো না। বললে, আপনি তো বলছেন—বলতে হবে না, কিন্তু না, ও বলুক। বলুক, ও আমার সঙ্গে কেন এই লুকোচুরি খেলা খেললে এতদিন !

বাসন্তী তার চোখের জল মুছে ফেলেছিল। এবার এই কথাটা শুনে অবিনাশের মুখের দিকে তাকালে। তাকাবামাত্র চোখ ছুটো তার জলে ভরে এলো। ছুটো হাত মুখে চাপা দিয়ে এবার সে সত্যিই কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললে, না—না, লুকোচুরি খেলা খেলি নি আমি। প্রাণের দায়ে মুখ বুজে চুপ করে ছিলাম।

অবিনাশ বলে উঠল, কেন ?

বাসন্তী বললে, একবার মুখ খুললেই তো আমার সব কথা বলতে হ'তো। বললেই তুমি আমাকে সেইখানে দিয়ে আসতে যেখান থেকে আমি চিরদিনের জন্য চলে এসেছি।

অবিনাশ বললে, তা হলে কি তুমি চিরটা কাল এমনি বোবা সেজেই থাকতে আমার কাছে ?

বাসন্তী বললে, না—না—না গোঁসাই, না। কথা বলবার

জন্যে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আর আমি পারছিলাম না চুপ করে থাকতে।

এই বলে খানিকটা থেমে সে সাম্‌লে নিলে নিজেকে। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে ভাল করে চেপে বসলো। তারপর কৃষ্ণদাসের দিকে তাকিয়ে বললে, প্রথম প্রথম আমরা যখন একটুখানি আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, দেখলাম, আমাকে পাবার লোভে সবাই ওকে আশ্রয় দিতে চাচ্ছে। তখনও তো মানুষটিকে চিনতাম না ভাল করে। ভেবেছিলাম—দিলে বুঝি আমাকে বিলিয়ে!

এই বলে ম্লান একটু হেসে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললে, তা যদি দিতে গোঁসাই, দেখতে আমি আত্মহত্যা করতাম। দাঁড়িয়ে রইলে কেন গোঁসাই, বোসো। সব কথা শুনবে যদি তো বোসো ভাল করে।

অবিনাশ বসলো। বসতে বসতে বললে, আমি কি করেছি না করেছি সে-কথা তোমাকে বলতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কথা বল।

বাসন্তী বললে, এও আমার নিজেরই কথা। আমি তো তোমাকে শোনাচ্ছি না। শোনাচ্ছি স্বামীজিকে।

প্রসন্ন হাসিতে স্বামীজির সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। বললেন, বল মা, বল।

বাসন্তী আবার আরম্ভ করলে।—এমনি কপাল নিয়ে আমি জন্মেছি, এক আমার বাবা ছাড়া আর একটি পুরুষমানুষও আমি দেখি নি যে আমার দিকে ভাল চোখে তাকিয়েছে। এই আমি প্রথম দেখলাম। খোঁড়া গাঙ্গুলীর বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। গাঙ্গুলী-মশাই গাঙ্গুলী-গিন্নী বাড়ি ছেড়ে ছিয়ে চলে গেলেন। ফাঁকা বাড়ী। গোঁসাই আর আমি। সবাই জানে আমি গোঁসাইয়ের স্ত্রী।

গোঁসাই জানে আমি বোবা। কথা কইতে পারি না। গোঁসাই যা খুশী তাই করতে পারতো। কিন্তু নির্বিকার এই মানুষটিকে দেখে শ্রদ্ধায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। দেখি, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। সারারাত ধরে তন্ময় হয়ে গোঁসাই গান লিখছে আর গুন্ গুন্ করে সুর দিচ্ছে। সকালে উঠে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে গোঁসাই আমাকে গান শুনিয়েছে। গান শুনে আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছি ওকে। গোঁসাই আমার প্রণাম নিতে চায় নি। হাঁ হাঁ করে ছু হাত দিয়ে আমাকে তুলে দিয়েছে। তারপর হাত জোড় করে সেও আমাকে প্রণাম করেছে। কথা বলবার জন্যে আমি তখন ভেতরে ভেতরে ছটফট করেছি। ভেবেছি, বলি—তোমাকে সেবা করবার অধিকারটুকু আমাকে দাও গোঁসাই। আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে দিও না।

অবিনাশ বললে, কথাবার্তা ভালই বল দেখছি। মনে হচ্ছে তুমি ভাল ঘরের মেয়ে।

বাসন্তী বললে, হ্যাঁ, আমি ভাল ঘরের মেয়ে। আমার বাবার ছিল লোহার কারবার। শহরের নামটা নাই-বা বললাম। মা মরেছে তখন আমি খুব ছোট। বাবার আমি একমাত্র মেয়ে। ভাল ঘরে বিয়ে দেবে বলে বাবা আমাকে লেখাপড়া শেখালে। বাড়িতে গানের মাস্টার রেখে দিলে নাচ-গান শেখাবার জন্যে। তোমার সব গান আমি মুখস্থ করে ফেলেছি গোঁসাই। নেচে নেচে তোমাকে আমি একদিন শুনিয়ে দেবো দেখো।

অবিনাশ বললে, একদিন নয়, আজই শোনাও। স্বামীজিকে শুনিয়ে দাও।

—নিশ্চয়ই শোনাবো। এখন যা বলছি তাই শোনো। আমার বাবার এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। আমার সেই কাকাবাবু আর কাকীমা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে এক-বাড়িতেই থাকতো।

কাকাবাবু কাজ করতো লোহার দোকানে, আর কাকীমা কাজ করতো আমাদের সংসারে। এই কাকাটি যে আমার আপন কাকা নয়, সে যে বাবার সৎভাই, সেকথা আমিও জেনেছিলাম অনেক দিন পরে। আমার বাবার ছিল বাতের ব্যারাম। কোথাও যেতে হলে বাবা তার এই ভাইটিকে ডেকে বলতো, তুই যা। আমার বিয়ের জন্যে ছেলে দেখতে যাবার ভার পড়তো আমার এই কাকার ওপর।

ছেলে কিন্তু কাকার পছন্দ হতো না। আমার গানের মাস্টার আমাকে একদিন বললে, দেখ বাসন্তী, আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে তোমার এই কাকাটিকে। তার ইচ্ছে নয় যে তোমার বিয়ে হোক। বললাম, তা আমি কি করতে পারি বলুন ?

শেষ পর্যন্ত মাস্টারের কথাই কিন্তু সত্যি হলো। বাবা পড়লো কঠিন অসুখে। অসুখে পড়ে বাবা আমার বিয়ের জন্যে ছটফট করতে লাগলো। কাকা বললে, তাই বলে জেনে শুনে মেয়েটাকে তো জলে ফেলে দিতে পারি না।

জলে আমি পড়লাম না সত্যি, বাবা কিন্তু আমার বিয়ে না দিয়েই মারা গেলেন। আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। কাকাবাবু হলো বাড়ির কর্তা। বলতে লাগলো, বিয়ে না দিয়ে আর তো রাখা চলে না ওকে।

এই বলে কাকাবাবু আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললে। কাকীমার এক ভাই এলো আমাদের বাড়ি বেড়াতে। দুটি ছোট ছোট ছেলে রেখে সম্প্রতি তার স্ত্রী মারা গেছে। শুনলাম নাকি তারই সঙ্গে আমার বিয়ে। লোকটা যেমন কদাকার তেমনি অভদ্র। এমন ব্যবহার করতে লাগল—তার সঙ্গে বিয়ে যেন আমার হয়ে গেছে। লোকটার অভদ্র ব্যবহার, ইতরের মত কথা-বার্তা আমাকে যেন পাগল করে তুললে। নিজের বাড়ির ভেতর

চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো—সে যে কিরকম অস্বস্তিকর ব্যাপার তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কোথাও যেন একটুখানি শান্তি পাচ্ছিলাম না। এমন একটা জায়গা নেই যেখানে গিয়ে দুদণ্ড চুপ করে বসে বসে কাঁদি, এমন একটা মানুষ নেই যার কাছে দুঃখের কথা বলে একটু সান্ত্বনা পাই।

আমার গানের মাস্টারকে কাকাবাবু জবাব দিয়ে দিয়েছে—বাবার মৃত্যুর পরেই। জবাব দিয়েছে, কিন্তু তিনি তখনও রয়েছেন আমাদের বাড়িতে। থাকবার কারণ, তিন-চার মাসের মাইনে তিনি পাবেন। টাকাটা ইচ্ছে করলে কাকাবাবু দিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু দিচ্ছেন না কিছুতেই। এমনিই তার স্বভাব। অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে টাকা না নিয়ে লোকটা চলে যায় তো যাক্।

এই মাস্টারের সঙ্গে বসে যখন গান শিখতাম, তখন মনে হতো যেন কিছুক্ষণের জন্য আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি।

সেদিন হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, বসবে নাকি ?

বসলাম গান শিখতে। গান শেখা কিন্তু সেদিন আর হলো না।

মাষ্টার বললেন, কি হবে ?

আমি শুধু একবার তাকালাম তাঁর মুখের দিকে। হঠাৎ মনে হলো এই লোকটি বোধহয় আমাকে বাঁচাতে পারে। এখান থেকে পালিয়ে যাই। এ-যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না। বললাম, আমি চলে যাব এখান থেকে। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন ?

খুব পারি। আমিও ভেবেছি। তোমাকে বলতে আমার সাহস হয় নি।

আর কোনও কথা নয়। আমার মায়ের অনেকগুলো গয়না আর হাজার-খানেক টাকা ছিল আমার কাছে। একটা পুঁটুলিতে বেশ করে বেঁধে মাস্টারের হাতে এনে দিলাম। বললাম, এইগুলো

নিয়ে আপনি আজই চলে যান। কাল বিকেলে, কাকা যখন বাড়িতে থাকবে না, তখন আমি বেরিয়ে পড়বো বাড়ি থেকে।

মাষ্টার বললেন, আমাদের গ্রামে ঢুকতেই দেখবে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ আছে, তারই তলায় আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। সেখান থেকে তোমাকে আমি নিয়ে যাব আমাদের বাড়িতে। আমার মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। তারপর তোমার যা ভাল মনে হয় তাই করবে।

আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে মাস্টার চলে গেলেন।

পরের দিন সূর্য তখনও ঠিক অস্ত যায় নি। আমি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। অকূলে ঝাঁপ দিলাম।

অতটা পথ একা কোনোদিন হাঁটি নি। চলে গেলাম সোজা নদীর তীরে তীরে। দু' দিকে আখের ক্ষেত। তারই ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। ভয়ে আমার বুক দুরদুর করছে। দেখতে দেখতে সূর্যের তেজ কমে এলো। পশ্চিম-আকাশটা রাঙা হয়ে উঠেছে। সূর্যাস্তের আর বেশি দেরি নেই। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হিমেল্ হাওয়া গায়ে মুখে এসে লাগছে। পাশেই বয়ে চলেছে দামোদরের ঘোলা জল। সেই জলের ওপর সূর্যের আলো মাঝে মাঝে চিক্‌চিক্ করে উঠছে।

সন্ধ্যের আগেই পৌঁছোতে হবে আমাকে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম।

এই তো এসে গেছি! ফাঁকা মাঠের ওপর এসে দাঁড়ালাম। সুমুখে প্রকাণ্ড সেই বটগাছ। মাস্টার যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনি। দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

মাঠের পরেই আবার দুটো আখের ক্ষেত। এই ক্ষেত দুটো পার হয়ে গেলেই ঢালু একটা গাড়ি-চলার পথ। আর সেই পথের ধারেই বটগাছের নিশানা। মাস্টার নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন

আমার জন্যে। ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু গাছের ডালপালা এত ঘন হয়ে নেমেছে চারিদিকে যে, গাছের তলাটা ভাল করে দেখাই যায় না।

হঠাৎ কেমন যেন খস্ খস্ আওয়াজ উঠলো পেছনে। পেছন ফিরে তাকালাম। কিছু দেখতে পেলাম না। এগিয়ে গেলাম। আবার আওয়াজ। আমার দুদিকে বড় বড় আখের গাছ মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। আমি সেই ক্ষেতের মাঝখানে সরু আল-পথের ওপর দিয়ে চলেছি। কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। ভাবলাম ছুটে চলে যাই। ছুটতে যাচ্ছি, এমন সময় দুদিক থেকে দুজন এসে দাঁড়ালো আমার সুমুখে। জোয়ান দুজন ছোকরা। দেখে গ্রামের ছেলে বলেই মনে হলো। একজন বললে, এসো আমাদের সঙ্গে।

বললাম, কেন? কোথায়?

বললে, মাস্টার আমাদের পাঠিয়েছে। বটতলায় চাষীদের মজলিস বসেছে, কাজেই অন্য পথ দিয়ে গ্রামে ঢুকতে হবে।

খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। একজন চললো আগে আগে পথ দেখিয়ে। আর-একজন আমার পেছনে। খানিকটা গিয়েই বাঁ দিকে যেতে হলো। আখ-ক্ষেতের ভেতর দিয়েই চলেছি। খানিকটা গিয়েই দেখি, আখ-ক্ষেত শেষ হলো। সুরু হলো অড়হরের ক্ষেত। কোথাও কিছু দেখা যায় না। দু' দিকে বড় বড় গাছ আমাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। মাঝখানের সরু পথ ধরে চলেছি মাত্র আমরা তিনজন। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। পথ যেন আর শেষই হয় না! এ কোথায় চলেছি আমরা? জিজ্ঞাসা করলাম, মাস্টার কোথায়?

—এই তো, এইখানেই আছে।

পেছনে যে আসছিল, সে বললে, এইখানে বসতে হবে।

সুমুখের লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে, বোসো।

চারিদিকে দুর্ভেদ্য ঘন গাছের সারি। তার ওপর আবছা অন্ধকার।

বললাম, এখানে বসবো কেন?

একজন বললে, বাইরে গেলে লোকজন দেখতে পাবে যে! এইখানেই তো অপেক্ষা করতে বলেছে। বোসোই না।

ভয়ে ভয়ে বসলাম। ওরা দুজন বসলো আমার দুপাশে।

—তারপর?

—তারপরেও বলতে হবে?

প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলাম শরীরে আমার যতটুকু শক্তি ছিল। কিন্তু পারি নি শেষ পর্যন্ত।

কখন্ যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম জানি না। জ্ঞান যখন হলো, চোখ চেয়ে দেখি, চারিদিক অন্ধকার। সেই ক্ষেতের মাঝখানে পড়ে আছি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলাম কিছুই মনে নেই। ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত অন্তর তখন ভরে গেছে। নিজেকেই ধিক্কার দিচ্ছি বারম্বার আর ডাকছি শুধু ভগবানকে।—এ তুমি কী করলে ভগবান?

ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি নামলো। আকাশে মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নদীর জল খুব বেড়েছে মনে হচ্ছে। জলের আওয়াজ যেন ক্রমশ বাড়ছে। ভাবলাম, ছুটে গিয়ে ওই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সব শেষ হয়ে যাক।

কিন্তু যদি না মরি?

অন্ধকারে কিছুই তো ভাল দেখতে পাচ্ছি না!

হাত-পা ভেঙে বেঁচে থাকি যদি?

এই সব ভাবছি আর এগিয়ে চলেছি। এবার খুব জোরে বৃষ্টি

নামলো। সমস্ত শরীর আমার ভিজে গেছে। মাথার চুল তো আগেই খুলেছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো খুব জোরে জোরে এসে লাগছে আমার সারা গায়ে। পরণের কাপড়টা এমনভাবে ভিজে পায়ে পায়ে লাগছে যে আর আমি হাঁটতে পারছি না। চোখ চেয়ে তাকাবার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে বসলাম একটা জায়গায়। কোথায় বসলাম কিছুই জানি না। মনে হলো কোনও গাছের তলায়। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগলো। আমাদের শহর থেকে দামোদর ছিল একটু দূরে। বর্ষার দিনে বাবার সঙ্গে গাড়িতে চড়ে দামোদরের বন্যা দেখতে যেতাম। দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছি তার সেই প্রচণ্ড মূর্তি। আর এখন? এখন আমি সেই দামোদরের তীরে রাত্রির অন্ধকারে একা বসে আছি। মৃত্যুকে তখন আর আমার ভয় নেই। মনে হচ্ছে আসুক বন্যা, আসুক মৃত্যু। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক, শেষ করে দিক—

বাসন্তী কেঁদে উঠলো মুখে হাত চাপা দিয়ে।

কৃষ্ণদাস তার মাথায় হাত রেখে বললেন, থাক্, আর বলতে হবে না।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে বাসন্তী অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললে, তারপর তুমি তো সবই জানো গোসাঁই।

অবিনাশ বললে, জানি। আজ আমরা চললাম স্বামীজি। ওদিককার সব ব্যবস্থা করে আমরা আসবো। আপনার সঙ্গী হব আমরা।

বাড়িখানা এমনি ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

অবিনাশ ভাবলে, বুড়ো গয়ারাম গাঙ্গুলীকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করতে দেরি হবে। তার চেয়ে নিজেরই যাওয়া ভাল।

পরের দিন সকালেই বেরিয়ে পড়লো অবিনাশ।

দামোদর পার হয়ে সেই দিনই বিকেলে বাঁকুড়া জেলার ছোট সেই গ্রামটিতে গিয়ে দেখে, খোঁড়া গাঙ্গুলী-মশাইয়ের মন টি ঁকছে না সেখানে। আসবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েই রয়েছে। অবিনাশকে দেখেই বললে, ভালই হলো, যাবার একটা সঙ্গী পেলাম। চল।

গাঙ্গুলী-গিন্নীর কিন্তু ইচ্ছা অন্যরকম। সে চায় মিহিরপুরে বাড়ি আর জমিজায়গা যা-কিছু আছে বিক্রি করে দিয়ে তার বাপের বাড়ির সেই গ্রামটিতেই জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দেয়।

এই নিয়ে—গাঙ্গুলী মশাই বল্‌লে, মাগীর সঙ্গে আমার এখানে এসে ইস্তক্‌ খিটির-মিটির লেগেই আছে। এখানে কী আছে যে তুই এখানে থাকবি? ফসল না-হয় এখানে ভাল হচ্ছে মানি, কিন্তু সে ফসল বেচবার একটা হাট নেই, কেনবার একটা লোক নেই, খেয়েদেয়ে ফেলে ছড়িয়ে বিলিয়ে দিতে হবে সব। এখানে আবার মানুষে থাকে? থাক্‌ তুই, মর্‌ এইখানে একা-একা। আমি চললাম।

গিন্নী বললে, ওরা তো পালাবে বলছে, তুমি নিজে রেঁধে খেতে পারবে?

বুড়ো বললে, পয়সা দিয়ে হোটেলে খাবো। ভাল না লাগে, মাইনে দিয়ে একটা লোক রাখবো।

—মাইনে দিয়ে লোক রাখবে তুমি! তবেই হয়েছে! শুকিয়ে মরে কোন্‌দিন পড়ে থাকবে ওই বাড়িতে। আমি বুঝতে পারছি।

—তা থাকবো তো থাকবো। তুমি মর এইখানে। আমি যাচ্ছি।

অবিনাশের তাড়া খেয়ে বুড়ো সত্যি-সত্যিই তৈরি হলো আসবার জন্যে। ইহজীবনের একমাত্র সম্বল তার টাকা আর নোটের তোড়াটি বাঁধলে কোমরে বেশ ভাল করে দড়িতে আর কাপড়ে গেরো দিয়ে-দিয়ে। গায়ে পরলে ফতুয়া। ফতুয়ার লম্বা পকেটে নিলে কয়েকটি দামী দামী দলিল। তারপর ঠেঙো ছুটি বগলে নিয়ে, এসে দাঁড়ালো অবিনাশের কাছে। বললে, চল।

গয়ারাম আর অবিনাশ দুজনেই বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

ঠেঙো বগলে নিয়ে ঠুক ঠুক করে বুড়ো বেশি দূর তখনও যায় নি। গ্রামটা পেরিয়ে সারি সারি কয়েকটা তেঁতুলগাছের তলা দিয়ে তারা দুজন তখন গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় মনে হলো পেছনে কে যেন তাদের ডাকছে।

অবিনাশ শুনতে পায় নি, বুড়ো কিন্তু ঠিক শুনেছে।

দেখা গেল বাগ্দীদের একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো তাদের কাছে। বললে, এইখানে একটু দাঁড়াও গো কত্তা, ঠাকুরুন বলে পাঠালে।

ঠেঙো নামিয়ে বুড়োকে বসতে হলো তেঁতুলতলায়। অবিনাশও বসলো।

খানিক্ পরেই মাথায় একটা টিনের তোরঙ্গ, বিছানার বাণ্ডিল আর হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে সেইখানে এসে দাঁড়ালো বুড়োর বাগ্দী মুনিষ ভূষণ, আর ভূষণের পিছু পিছু হাতে পানের ডিবে নিয়ে গাঙ্গুলী-গিন্নী। গাঙ্গুলী-গিন্নীর পরনে লাল কস্তাপাড় শাড়ি, মুখে পান আর দোক্তা।

ভূষণকে দাঁড়াতে দেখে গাঙ্গুলী-গিন্নী রাস্তার ওপর পানের পিক্ খানিকটা ফেলে বলে উঠলো, হাঁ করে আবার দাঁড়ালি কেন, চল্!

বুড়ো উঠে দাঁড়ালো। বললে, তা সঙ্গে আসতে কি হয়েছিল?

বুড়ী তার সঙ্গে কথা বলবে না। চলতে চলতে সে আপন মনেই বলতে লাগলো, ঘর-দোর গুছিয়ে লোকজন শোবার ব্যবস্থা করে আসতে হবে তো? না, হুট্‌ করে অমনি চল্‌ বলতেই চল্‌!

বাড়ির জিনিসপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে বাসন্তীকে সঙ্গে নিয়ে অবিনাশ এলো ধরমশালায়। কৃষ্ণদাসের কাছে মন্ত্র নিয়ে তাঁরই সঙ্গে তারাও যাবে বৃন্দাবন।

কিন্তু এসেই দেখে অশ্বত্থগাছের তলায় কৃষ্ণদাসের আস্তানা ফাঁকা। ধুনির আধপোড়া কাঠ আর কিছু ছাই পড়ে আছে শুধু।

উটের গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মশালার চাকরটা যাত্রী নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ একসময় অবিনাশের দিকে নজর পড়তেই বলে উঠলো, সাধুজি-মহারাজ চলে গেছে।

—কখন গেছেন?

—আজ সকালে।

অবিনাশ বাসন্তীর মুখের দিকে তাকালে।

বাসন্তী বললে, চল। পায়ে হেঁটে আর কত দূর যাবেন!

অবিনাশ বললে, একদিন-না-একদিন ধরে ফেলবো ঠিক। চল।

দুজনেই পথে গিয়ে নামলো। চললো বৃন্দাবনের দিকে। কৃষ্ণদাসের সন্ধানে।